গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

ফেব্রুয়ারী - মার্চ ২০২৬ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- শোক সংবাদ / পৃ. ২
- ডি-পপুলেশন ও ডি-ভোটার / পৃ. ৩
- অনুপ্রবেশ: একটি রাষ্ট্রীয় অপনির্ম্মাণ... / পৃ. ৬
- আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস/ পৃ. ৯
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (১১ কিস্তি) / পৃ. ১১
- মাওবাদী মুক্ত ভারত– এই ঘোষণার অর্থ কী / পৃ. ১৩
- বিশেষ প্রতিবেদন: ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট স্টেট রিপ্রেশন / পৃ. ১৫
- বিজ্ঞানকর্ম্মী আমীরচাঁদের ঘটনা / পৃ. ১৭
- সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি.../ পৃ. ১৮
- জামিনের শর্ত/ পৃ. ১৯
- রূপান্তরকামী আইনের সংশোধন.../ পৃ. ২০
- বিশেষ প্রতিবেদন: সুরেন্দ্র গাডলিং-এর মুক্তির দাবি / পৃ. ২১
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ২২-২৮
- রিপোর্ট / পৃ. ২৮-৩২

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : আলতাফ আহমেদ
(9874878100) কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

ভোট না প্রহসন ?

চলছে বৃহৎ গণতন্ত্রের উৎসব! পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচন। এমন-এক ভোট যেখানে SIR এর নামে প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম কাটা গেছে। জনসাধারণের একটা বিরাট অংশের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তৈরী হয়েছে 'বিশুদ্ধ' ভোটার লিষ্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনায়াসেই বাংলার জনসাধারণকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এবার ভোট না-দিলেও কোন অসুবিধা নেই। পরে হয়তো দিতে পারবে। জনসাধারণের ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। বেছে বেছে মুসলমান, হিন্দু উদ্বাস্তু দলিত, মহিলা ও প্রান্তিক শ্রমজীবী জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্ট একাধারে বলছে দেশের নাগরিক না হলে ভোট দেওয়ার অধিকার নেই, তাই SIR এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব যাচাই করা হচ্ছে। আবার বলছে NRC করা হচ্ছে না। এ-এক অসম্ভব দ্বিচারিতা। আসলে বাংলার জনসাধারণ দেশের নাগরিক-কী-নাগরিক নয়, এটাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নির্বাচন কমিশন ও বিচার ব্যবস্থা। SIR এর নামে করা হচ্ছে এনআরসি। পরে হবে ডিটেনশন ক্যাম্প।

গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাংলার অধিবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এতদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের বন্দুকের নলের ডগায় অথবা রাজনৈতিক দলগুলোর পোষা গুন্ডা বাহিনীর বন্দুক ও বোমার সামনে সাধারণ মানুষকে নির্বাচনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। প্রতি নির্বাচনেই সাধারণ মানুষের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ করেছে একাধিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংগঠন। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচন মৌলিকভাবে অন্য সকল নির্বাচনের থেকে আলাদা। এবার নির্বাচনকে হাতিয়ার করে বাংলায় ৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশের বন্দুকের নলের ডগায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার। নির্বাচন কমিশন থেকে বিচার ব্যবস্থা, আধা সামরিক বাহিনী থেকে পুলিশ এবং সমস্ত সংসদীয় বড় রাজনৈতিক দল থেকে ছোট রাজনৈতিক দল, সকলেই নির্বাচনের নামে বাংলার জনসাধারণের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার হরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে বা উদ্যোগে অংশীদার হয়েছে।

ছোট-বড় সকল সংসদীয় রাজনৈতিক দলই বৈধ ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরী'র কথা বলে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব হরণকারী SIR লিষ্টকে বৈধতা দিচ্ছে। বিশেষভাবে তৃতীয় ধারার সংগ্রামী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর একাংশের নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে ভোট প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়া সচেতন বিবেকবান মানুষের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সংগঠনগুলি বুঝতেই চাইছে না যে এই নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া মানে আসলে SIR-কে বৈধতা দেওয়া। মেনে নেওয়া। মুখে অনেক কিছু বললেও কার্যত তাঁরা SIR লিষ্টের পক্ষে দাঁড়িয়ে বাংলার জনসাধারণের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষেই দাঁড়াচ্ছে। মুসলমান প্রধান সংসদীয় দলগুলিরও একই অবস্থা। বড় পার্টির সাথে জোট করে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার তাগিদে তারাও SIR লিষ্টকে বৈধতা দিচ্ছে। মুসলমান জনসাধারণের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নটি তাদের কাছে যত-না চিন্তার, তার থেকে বেশী চিন্তা নির্বাচনী উৎসবে কী ভাগ নেওয়া যায়, কী করে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া যায়! সকলেই আসলে বিজেপি আর-এস-এসের এজেন্ডায় পা জড়িয়ে চলছে।

আরএসএস বিজেপির তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার নামে মুসলমান, হিন্দু উদ্বাস্তু দলিত, মহিলা ও ব্যাপক সংখ্যার শ্রমজীবী মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার জন্য যে প্রয়োজনীয় ভোটার লিষ্ট দরকার, সেটারই নাম হচ্ছে SIR। আর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করতে গিয়ে আরএসএস বিজেপি হাত মিলিয়েছে কর্পোরেটের স্বার্থের সাথে। কারণ কর্পোরেটের সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য প্রয়োজন সস্তার মজুর। মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের নিচে থাকা অত্যান্ত মূল্যবান সম্পদ দখল করতে জল, জঙ্গল, জমি লুট করছে কর্পোরেটেরা। ভারত রাষ্ট্রের আধা সামরিক বাহিনী এই কর্পোরেটগুলোর স্বার্থে জল জঙ্গল জমির ওপর নির্ভরশীল আদিবাসী ও মাওবাদীদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে নির্বিচারে হত্যা করছে অপারেশন কাগারের নামে। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে কোনও তোয়াক্কা না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুক ফুলিয়ে বলেছে ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে মাওবাদীদের খতম করে দেবে। আর সবকিছুই করা হচ্ছে কর্পোরেটকে সর্বোচ্চ মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার স্বার্থে। কিন্তু এত কিছু করেও বড় বড় শিল্পপতিদের পেট ভরছে না। তাদের এবার চাই সস্তার মজুর। বড় বড় খনি তৈরির জন্য মধ্য ভারতসহ দেশের যেসব এলাকায় শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করছে, সেই সব জায়গায় কাজ করার জন্য এই সস্তা মজুরের প্রয়োজন। এই মজুরদের কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার থাকবে না।

আসামে NRC করে যাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরও কোনও অধিকার নেই। বাংলার ক্ষেত্রেও এই একই 'আসাম মডেল' ফলো করা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত অধিকারহীন মজুর কোথা থেকে আসবে? এই মজুর আসবে নির্বাচনের নামে যাদের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে। ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পর যাদেরকে ডিটেশন ক্যাম্পে রাখা হবে তাদের মধ্যে থেকে। তারা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবে। আর যেহেতু এই পুরো বিষয়টা হিন্দুত্ববাদী ও বর্ণবাদী বিজেপি আরএসএস-এর নেতৃত্বে হচ্ছে, তাই এই ব্যাপক মজুর আসবে মুসলমান, দলিত, আদিবাসী ও মহিলাদের মধ্যে থেকে। এই বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই জনসাধারণের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। SIR লিষ্টের মধ্যে দিয়েই বাংলার জনসাধারণের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

আমরা সমস্ত ছোট বড় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কাছে আহ্বান করছি যে জনসাধারণের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার এই উৎসবে না-মেতে বিজেপি আরএসএসের এই জনবিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করা হোক। জনসাধারণই সিদ্ধান্ত নিক এই প্রহসনের নির্বাচনে তারা কী ভূমিকা নেবে। সাথে সাথে বাংলার সমস্ত অধিবাসীকে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব হরণকারী SIR বাতিলের দাবিতে গণআন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান রাখছে এপিডিআর।

শোক সংবাদ

না ফেরার দেশে চলে গেল বাবলা ওরফে বসন্ত ভট্টাচার্য্য

হ্যাঁ, বসন্ত নামটা অবশ্য খুব পরিচিত নয়, অধিকাংশ মানুষই চেনেন এবং ডাকেন বাবলা নামেই। গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাত ১২টা তিরিশ মিনিটে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ জনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ভোররাতে অকালেই প্রয়াণ ঘটে আমাদের প্রিয় বাবলার, মাত্র ৫৮ বছর বয়সে। জন্ম ১লা জানুয়ারী ১৯৬৬ সালে। পিতা বিকাস ভট্টাচার্য্য, মা প্রতিমা ভট্টাচার্য্য। মৃত্যুকালে রেখে গেলো স্ত্রী ,পুত্র এবং দুই কন্যা, নাতি নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষদের। বাবা ছিলেন (বিশ্ব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের) শ্রমিক। অর্থনৈতিক সংকট ছোটবেলা থেকেই বাবলার জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। ২০১৯ সালে গড়িয়াতে এপিডিআর -এর শাখার প্রতিষ্ঠা হলে অব্যবহিত পরেই বাবলা আমাদের শাখার সদস্যপদ গ্রহণ করে। সংসদীয় রাজনীতির উল্টোপথে

শেষ অংশ ৩২ পাতা

ডি-পপুলেশান ও ডি-ভোটার এই দুই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অঙ্গ সার (SIR)

শুভ্র

এবারের এস আই আর এর উদ্দেশ্য শুধু মৃত বা ভুয়ো ভোটার বাতিল করার জন্য চিরাচরিত ইন্টেসিভ রিভিসান ছিল না। এটা ছিল, জনগনের নাগরিকত্ব হরণের প্রচেষ্টার অঙ্গ। এই ষড়যন্ত্র আজ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জুড়ে চলছে। জার্মানিতে হিটলার এক সময় এই নীতি প্রথম প্রণয়ন করে ইহুদীদের জন্য। কারণ, কিছু ইহুদী ব্যবসায়ীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে গিয়ে ব্রিটেনকে আর্থিক সহযোগিতা করে। যার মাথা ছিল রথচাইল্ড গ্রুপ। যারাই আবার জায়নবাদ এবং ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় আর্থিক দাতা। আবার এরাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করে।

ইহুদী ও খ্রীষ্টান বিরোধ-তো বহু দিন ধরে ইউরোপে ছিলই। যদিও কিছু ইহুদী ব্যবসায়ীর জন্য একটা গোটা জাতিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে হিটলারের হত্যালীলা চালানো ছিল চরম মানবতাবিরোধী কাজ। কিন্তু একই কাজ এই জায়নবাদী ইহুদীরা আরবে করে প্যালেষ্টাইনের জনগণকে হত্যা করে ইসরায়েল গঠন করতে গিয়ে। এরাই জেনোসাইডের মতন ঘৃণিত গণহত্যাকারী নীতির প্রবক্তা, যা নাগরিক সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এরাই মধ্যযুগে প্রথমে মেসোপটেমিয়া, তারপর মিশর, তারপর ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে প্যালেষ্টাইন থেকে রোমানদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস শুরু করে। এরপর ফরাসি বিপ্লব ও নবজাগরণের পর এরা ইউরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতি নিজেদের কব্জায় নেয় ব্যাঙ্কিং ব্যাবস্থার নামে সুদের কারবার চালু করে।

প্রসঙ্গতঃ এই সুদের ব্যাবসার দুষ্কর্মের জন্যই এরা মধ্যপ্রাচ্যে বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবশেষে ইউরোপে শরণার্থীর মতন আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সে সব হয়েছিল রাজতন্ত্রের যুগে। আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যুগে এদের এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কুটনীতি এবং বাজারে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন এদের আধুনিক বিশ্বে বহু কুকর্ম্মের প্রেরণা হয়ে উঠেছে। সেটা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পরাজয় দিয়ে হোক, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোক, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে হোক বা তার পরে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্যালেষ্টাইনের জনগণের উপর নিপীড়ন করে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করিয়ে হোক।

এই ঘৃণ্য স্বরূপ আমরা ভারতেও দেখি এক ভাবে। ভারতে থাকা ইহুদীরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েনি। যেমন এরা প্যালেষ্টাইনের ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়েও অংশ নেয়নি। আবার ভারত স্বাধীন হবার পর বড় সংখ্যক ইহুদী ভারত ছেড়ে ইসরায়েলে চলে যায়। আজ প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা নিয়ে ভারতে দাবি উঠলে ভারতে জায়নবাদী ইসরায়েলের বন্ধু সংগঠন আর এস এস এটা মুসলিম প্রেম বলে নানা অপপ্রচার করে। কিন্তু বাস্তব এটাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পিরিট-বিরোধী চিন্তা এটা। যাকে সুভাষ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, নেহেরু এবং গান্ধীজী কেউই সমর্থন করেননি এবং নিন্দা করেছেন। ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কার্ল মার্ক্সও ইহুদী জাতীয়তাবাদের কট্টর সমালোচক ছিলেন। বলশেভিক পার্টির বুন্দের ট্রেড ইউনিয়ন ভাঙার ইহুদী জাতিয়তাবাদীদের চক্রান্তকে কঠোর সমালোচনা করেছেন লেনিন, 'জিউস ওয়ার্কার্স কোশ্চেন' বক্তব্যে। নেহেরু নিজে আইনষ্টাইনের অনুরোধ পত্র রিফিউজ করে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনকে এই জন্য সমর্থন দেননি। আজও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সৃষ্ট অশান্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবিষ্যৎ বাণীকে বাস্তব করছে, ''জায়নবাদী নেতৃত্ব যদি ফিলিস্তিনে আরবদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে ইহুদিদের স্বার্থকে পৃথক করে রাখার বিষয়ে জেদ ধরে, তবে এই পবিত্র ভূমিতে অত্যন্ত কুৎসিৎ ও ভয়াবহ বিস্ফোরণ (বা দাঙ্গা) ঘটবে।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্য জিউশ ষ্ট্যান্ডার্ড)

ইহুদী জায়নবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে চলা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আজ হিটলার ও জায়নবাদীদের রাস্তায় হেঁটে গণতান্ত্রিকভাবে নাগরিকত্ব হরণের পথ দেখাচ্ছে নতুন অভিবাসন নীতি এনে। তবে এক্ষেত্রে এর কারণটা আলাদা। বর্তমান কারণ AI এর প্রসার ও বেকারত্বের সমস্যা প্রসূত বিদ্রোহ নিবারণের আগাম ব্যাবস্থা। এখন ও AI ডেভেলপিং স্তরে আছে। পূর্ণভাবে এর বিকাশ সম্পন্ন হলে মানুষের শ্রমের ভূমিকা শেষ হবে। তখন বেকার ব্যাপক জনগণের বিদ্রোহ দমন আর ও কঠিন হয়ে পড়বে। তাই আগে থেকেই ধীরে ধীরে জনসংখ্যা কমানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

যে আমেরিকা দেশটাই গড়ে উঠেছে অভিবাসনের উপর ভিত্তি করে। যাদের কোনও সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য ছিল না, প্রাচ্য বা মধ্যপ্রাচ্যের মতন। আমেরিকাই সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি হবার পর থেকে এই লোভ জনগণকে দেখিয়েছে যে, তাদের দেশ সবচেয়ে উন্নত, আর বাকিরা সব অনুন্নত। আমেরিকা বিভিন্ন দেশে জুলুম করে সে দেশের নাগরিকদের মেরেছে, ইচ্ছা মতন গভর্মেন্ট বদলেছে। তাদের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত করেছে। তাদের অর্থনীতি কুক্ষিগত করতে নানা অপকর্ম্ম করেছে এরা দিনের-পর-দিন। তারপর সে-দেশের

নাগরিকদের বেনাগরিক করে শরণার্থী বানিয়ে অন্য দেশে পালাতে বাধ্য করেছে। সম্প্রতি ভেনিজুয়েলার নির্বাচিত সরকারের প্রেসিডেন্টকে স্বস্ত্রীক অপহরণ এবং বর্তমান ইরাণ সঙ্ঘাত তারই প্রমাণ।

আমেরিকারই এরকম চক্রান্তের ফলে মায়ানমারে মার্কিন পোষিত শান্তিতে নোবেল প্রাপক প্রধানমন্ত্রী সু চি'র নেতৃত্বে রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষের উপর চরম নিপীড়ন করে তাদের শরণার্থী করতে বাধ্য করে দু' দশক আগে। একদিন বাংলাদেশ ছেড়ে বহু মানুষ ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান ও মার্কিন আঁতাতে বাংলাদেশের জনগণের উপর নিপীড়ন চালানোর জন্য ইসলামিক মৌলবাদের সহায়তায়। তখন ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার সেই শরণার্থীদের ভারতে স্থান দিয়েছে। বামপন্থীরাও পশ্চিমবঙ্গে তাদের স্থান দিয়েছে। এই ঘটনার ৫০ বছর পর ভারতের বিজেপি সরকার বাংলাদেশী, রোহিঙ্গা খোঁজার নাম করে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার লুণ্ঠিত করতে চাইছে। ঠিক যেভাবে আমেরিকায় মেক্সিকান এবং ভারতীয়দের নাগরিকত্ব হরণের প্রচেষ্টা চলছে। কারণ, এক সময় আমেরিকাও নিজেদের সস্তার শ্রমিকের প্রয়োজনে ভারত ও মেক্সিকান অভিবাসীদের গ্রহণ করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু আজ তারা দেখছে যে, AI-যুগে মানুষের প্রয়োজন শেষ হবার পথে। অতীতের সব টেকনোলজি মানুষের কায়িক শ্রম কম করতে তৈরি হয়েছিল। AI এমন টেকনোলজি যা মানুব শ্রমের প্রয়োজন তার উন্নতির সাথে সাথে শেষ করবে। তাই একদিন যে-আমেরিকা সস্তার শ্রমিক খুঁজতে যে-প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়েছিল আজ তা' প্রয়োজনহীন হয়ে পড়ছে। উল্টে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা আমেরিকায় বৃদ্ধির ফলে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে ও ভারত সহ প্রাচ্যের দেশগুলির নাগরিকরা একটা বড় জায়গা করে নিচ্ছে। ফলে তাদের শ্বেতাঙ্গ ও জায়নবাদী অহংকার আহত হচ্ছে।

প্রাচ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জায়নবাদের শিকলকে দূর্বল করছে আমেরিকায়। যেটা জায়নবাদীদের একটা চিন্তার বিষয়। কারণ, আমেরিকাকে দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে তারাই সমস্ত কুট পরামর্শ, অর্থ ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা দিয়ে আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে বিশ্বে গুন্ডাগিরির মাথা হিসাবে ধরে রাখতে সহযোগিতা করেছে। যদি ও তারা নিজেদের এই ঘৃণ্য কর্ম্ম অনেক রেখে-ঢেকে করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরামাণু বোমা বানাতে ম্যানহাটান প্রোজেক্টে ইহুদী বিজ্ঞানীদের ভূমিকা, রথচাইল্ডদের ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যাওয়া, ইসরায়েল আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার অতি উৎসাহী ভূমিকা, ইসরায়েলিদের আমেরিকায় ঢালাও দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির সাথে ইসরায়েলের পরামাণু গবেষণা নিয়ে বিবাদ এবং কেনেডির রহস্যজনক হত্যা, আমেরিকায় ৬৩ লক্ষ ইহুদীর বাস এবং ইসরায়েলে ৭৩ লক্ষ ইসরায়েলের বসবাস, আর সম্প্রতি এপষ্টিন ফাইল ও আমেরিকার ইরাণ যুদ্ধে যুক্ত হওয়া সহ একাধিক ঘটনায় এটা স্পষ্ট মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি জায়নবাদের অর্থনীতি ও কুটনীতি প্রসূত।

প্রাচ্যের প্রভাব আমেরিকার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পেলে জায়নবাদীদের রাশ দূর্বল হতে পারে। ফলে, একদা যীশু হত্যার অপরাধী ইহুদী ও যীশুর ভক্ত খ্রীষ্টানরা এক হয়ে আমেরিকায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অভিবাসন নীতি আনার কথা ভাবছে। এর বলি হচ্ছে ভারত সহ প্রাচ্যের জনগণ ও মেক্সিকো সহ দক্ষিণ আমেরিকার জনগণ। ট্রাম্প দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসেই ভারতের বহু অভিবাসীকে কোমরে শিকল বেঁধে ভারতে পাঠায়। জায়নবাদী ইসরায়েল ও আমেরিকার বন্ধু বিজেপি সরকার তখন টু শব্দ-টুকু করেনি। ভারত অপমানিত হবার পরও। মধ্যপ্রাচ্যে এবং প্রাচ্যে এরাই ইসলামিক ও হিন্দু মৌলবাদের রক্ষাকর্তা। এদের দিয়ে এরা মধ্যপ্রাচ্যে এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে একদিকে আমেরিকায় ডি পপুলেশান নীতি অন্যদিকে ডি ভোটারের আড়ালে নাগরিকত্ব হরণের নীতি প্রণয়ন করে চলছে।

আমেরিকার দেখা-দেখি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একই বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমেরিকা ও ইসরায়েলের তল্পিবাহক ভারতের বর্তমান বিজেপি সরকার একই পথ ধরেছে। ডিটেনশান ক্যাম্প চালু করার কথা বলছে। ভারতীয় নাগরিকদের সস্তার শ্রমিক বানিয়ে গোলাম করতে চাইছে। সাথে আমেরিকান মেডিক্যাল কোম্পানিগুলির দ্বারা ভারতে ডি-পপুলেশানেরও নানা চক্রান্ত করছে HVP এর মতন ভ্যাক্সিন বাজার জাত করতে বাধ্য করিয়ে। এর ফলে বন্ধ্যাত্ব বাড়ছে। এ-নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ হচ্ছে। কোভিড প্যানডামিক নিয়ে এপষ্টিন ফাইলে বিল গেটসের চক্রান্ত সামনে এসেছে। কোভিড ভ্যাক্সিনের ফলে হৃদ রোগ বেড়েছে। এসব নিয়ে বহু কেস মেডিক্যাল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে হয়েছে। যার ভয়াবহ চিত্র সামনে এসেছে। যা ভ্যাক্সিন চক্রান্ত দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে। মনোবৈজ্ঞানিক নানা কুকর্ম্মও তারা করে চলেছে। যেমন, ডিজে নামক অতি গম্ভীর আওয়াজ যুক্ত বক্সের আমদানি এবং তা' বাজার জাত করে তোলা। মানুষের সামাজিক মেলামেশা, খেলাধুলা বন্ধ করতে ফ্রি ইন্টারনেট ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্লোগান দেওয়া করেছে।

এপষ্টিন ফাইলে এটা প্রকাশিত হয়েছে ভারতের বর্তমান

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদ্বীপ সিং পুরি এই বিষয় ২০১৪ সালে এপষ্টিনের মতন ধর্ষকের সাথে আলোচনা করছে ভারতে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে ফ্রি নেট চালুর দুই বছর আগেই। খেয়াল করলে দেখা যাবে ভারতের জন্মহার এর ফলে ব্যাপক ভাবে কমছে। যার প্রভাব আগামী কয়েক দশকে ভারত পড়বে। WHO ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কোনও দেশের স্বাভাবিক জন্মহার একটি দম্পতি পিছু ২.১ হওয়ার কথা। যা বর্তমানে ১.৯। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটা ১.৪ এর কাছে। এর সাথে ভারতের জনগণের মধ্যে মানসিক সমস্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। ডিভোর্স বাড়ছে। সাথে বিভিন্ন রোগের আমদানি হচ্ছে।

ভারতের কৃষিজ অর্থনীতিকেও এরা সবুজ বিপ্লবের নামে হাতিয়েছে। আজ কৃষকের বীজ, সার এদের কোম্পানিগুলি দেয়। ভারতীয় কৃষকদের আর বীজ এবং ফসলের মূল্য নির্ণয়ের অধিকার নেই। কৃষিতে ব্যাপক কীটনাশকের ব্যবহারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের মতন মারণ রোগ দেখা দিচ্ছে রাসায়নিক সারের প্রভাবে। ভারতের ফসলে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যাবহারের ফলে ভারতের সাধারণ মানুষ ও নানা অবাঞ্ছিত রোগের স্বীকার হচ্ছে। আর এটাও ডি পপুলেশানের একটা অঙ্গ হিসাবে কাজ করছে। আবার ভ্যাক্সিন ষড়যন্ত্রও কাজ করছে। যার সত্যতা এপষ্টিন ফাইলের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই সামনে চলে এসেছে মার্কিন ধনকুবের বিল গেটসের চক্রান্ত হিসাবে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে জনসংখ্যা হ্রাস এই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রীদের প্রধান টার্গেট। যেটা দু'টি উপায়ে সংঘটিত হচ্ছে। এক, ডি পপুলেশন ও দুই, বেনাগরিকত্ব। আর এর সফট টার্গেট এখন জনবহুল ভারত।

অন্যদিকে নাগরিকত্ব হরণের ষড়যন্ত্র হিসাবে ২০১৭ সালের প্রথম ইসরায়েল সফর শেষের দু' বছর পর ২০১৯ সালে মোদীর নাগরিকত্ব হরণের জন্য আনা সি এ এ বিল ভারতের জনগণ গ্রহণ করেনি। সি এ এ, এন আর সি বিরোধী আন্দোলন জোরদার হবার ফলে বহু বিরোধী শাসিত রাজ্যেই জনগণকে বেনাগরিক করার টার্গেট পূর্ণ করতে পারেনি বিজেপি সরকার। তাই এস আই আর-এর ফন্দি এঁটে ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে একটা বৃহত্তর চক্রান্ত করছে বিজেপি এস আই আর-এর মধ্যে দিয়ে ডি-ভোটার তৈরী করতে। এই সমস্যা থেকে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম, আর জেডি, এস ইউ সি সহ কোনও দলের কর্ম্মী সমর্থকই বাদ যাচ্ছে না। বাংলায় এই চক্রান্ত বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা ধরার নাম করে সঙ্ঘটিত হচ্ছে। কিন্তু এস আই আর-এর ফলে বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাদের খোঁজ না মিললেও ইতিমধ্যে এর ফলে ২২০ জন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ, বার-বার তথ্য দেওয়ার পরও স্বেচ্ছাচারির মতন বহু নাম বাদ দিয়েছে বিজেপির মুখ্য নির্ব্বাচন কমিশনর জ্ঞানেশ কুমার ও তার দলবল। যা' আদতে নির্য্যাতন কমিশনে পরিণত হয়েছে। এই তালিকায় যেমন অমর্ত্য সেনের মতন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদের নাম উঠেছে; বাংলার নবাব পরিবার সিরাজদ্দৌলার পরিবারের নাম উঠেছে, সুভাষচন্দ্র বসু, নন্দলাল বসুর পরিবারের সদস্যদের নাম উঠেছে, বহু প্রাক্তন সেনা কর্ম্মী, প্রাক্তন এমপি, বহু আমলার নাম উঠেছে। তেমন অগণিত সাধারণ মানুষের নাম উঠেছে। নজিরবিহীন ভাবে প্রায় ১০ শতাংশ ভোটারকে বাদের খাতায় ফেলে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। সর্ব্বপরি এই চক্রান্তে সায় দিয়ে গেছে ভারতীয় জনগণের শেষ আস্থার প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৪ সালে বিচারপতি লোহিয়া হত্যা চেপে দেওয়া, বিচারপতি দীপক মিশ্র'র বিরুদ্ধে সরাসরি চার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির বিদ্রোহ, তারপর পার্লামেন্টে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা; এরপর রামমন্দির নিয়ে রায় ও রায়দানকারি প্রধান বিচারপতিকে অবসরের পর রাজ্য সভার সাংসদ করা, আরাবল্লির রায়; এই সব ঘটনায় আগেই প্রমাণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট এখন স্বাধীনতা হারিয়েছে। ২০২৪ সালের মুখ্য নির্ব্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংশোধন হয়ে সেখানেও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে কেন্দ্র সরকারের হাতে এসে গেছে। ফলে বুঝতে কারও বাকি থাকে-না যে, পুরো সিস্টেমটাই দুর্নীতিতে ভরে গেছে।

এপষ্টিন ফাইলে ফেঁসে মোদী সরকার ভারতকে আমেরিকার কাছে বেচে দিচ্ছে। আর ভারতের সামনে দ্বিতীয় স্বাধীনতার লড়াই শুরু করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প রাখা হল না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালি করতে গিয়ে সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে বর্তমান ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার। এখন শুধু সৌদির রাজাদের মতন ভারতে মার্কিন বেস বানানোর অনুমতি প্রদানটাই বাকি আছে।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

অনুপ্রবেশ: একটি রাষ্ট্রীয় অপনির্ম্মাণ ও মিথ্যাচার

অজেয় পাঠক

গত স্বাধীনতা দিবসের (১৫ আগস্ট ২০২৫) লালকেল্লা-ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের অন্যতম বিপদ হিসেবে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষণে এই প্রসঙ্গে চারটি বক্তব্য ছিল এইরকম, এক, ''একটি সু-পরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে দেশের জনবিন্যাস পাল্টে ফেলা হচ্ছে এবং এক গভীর সমস্যার বীজ বপন করা হচ্ছে।'' দুই, ''এদের লক্ষ্য আমাদের মা ও বোনেরা। এরা আদিবাসীদের ঠকিয়ে তাদের জমি দখল করে নিচ্ছে।'' তিন, ''বেআইনি অনুপ্রবেশ এদেশে সংঘর্ষের বীজ বপন করেছে। কোনও দেশই অনুপ্রবেশকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। আমাদের দেশই বা সেটা করবে কেন?'' চার, ''অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা দেশের যুব-সমাজের জীবন-জীবিকা ছিনিয়ে নিচ্ছে।''

গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী আসামের গুয়াহাটিতেও একইরকম বক্তব্যে বলেন যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বিপদ। গত ২৭ মার্চ ২০২৫ দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় ''ইমিগ্রেশান এন্ড ফরেনার্স বিল ২০২৫'' পেশ করার সময় বলেন, ''দেশের নিরাপত্তার পক্ষে যারা বিপজ্জনক, তাদের দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আমাদের দেশ কোনও ধর্মশালা নয়।'' এর আগেও তিনি অনুপ্রবেশ-এর বিপদ সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রেখেছেন। মানুষের পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস দেখে তিনি অনুপ্রবেশকারী বা 'ঘুসপেটিয়া' চিহ্নিত করতে পারেন, এমনও দাবি করেছেন। গত বেশ কয়েক বছর ধরে অনুপ্রবেশ নিয়ে শাসক-বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীরা নিয়মিতভাবে বলে চলেছেন। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান ভারতে ২ কোটি অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আছে। কিন্তু ২০১৮ সালে একটি আরটিআই'য়ের উত্তরে কেন্দ্র জানায়, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কোনও তথ্যই নেই। এর আগে ২০০৪ সালে ইউপিএ সরকার সংসদে ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশী মানুষের সংখ্যা ১.২ কোটি জানিয়েছিল। ২০০৮ সালে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী দাবি করেন যে ভারতে ৩.৫ কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী নাকি পরিচয় গোপন করে আছে।

২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি, অর্থাৎ আডবাণীর দাবি অনুযায়ী, সে দেশের ২৫ শতাংশ লোক ভারতে লুকিয়ে ছিল! ২০১৬-তে সেই সংখ্যাটা ২ কোটি হয়ে গেল। এইভাবে এক-একবার বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রীয় প্রচার করে অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে একটি মিথ তৈরী করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের গণনা অনুযায়ী দেশে জনসংখ্যা দশকে বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৯ শতাংশ। ২০০১-এর গণনায় তা' কমে হয়েছে ২১.৫ শতাংশ। ২০১১-র গণনা দেখিয়েছে এই বৃদ্ধির হার আরও কমে হয়েছে ১৭.৬। কেউ ভাবতে পারেন, অন্য রাজ্যের বৃদ্ধির হার কম এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার বেশী হলেও গড়ে এ-রাজ্যের হার কমে যেতে পারে। তা' হলে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার দেখা যাক। জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী, '৯১-এর জনগণনায় পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৭৩ শতাংশ। ২০০১ সালের গণনায় তা' নেমে আসে ১৭.৭৭ শতাংশে। ২০১১ সালের জনগণনায় রিপোর্টে তা' আরও নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩.৯৩ শতাংশে। ১৯৮১-র গণনা থেকেই দেখা যাচ্ছে এই হার ক্রমাগত নেমে আসছে। ওদের কথায়, যে কোটি কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এ দেশে প্রতিদিন ঢুকে পড়ছে এবং স্থানীয় মাতব্বরদের সহায়তায় ভোটার তালিকায় নাম তুলে দিব্বি নাগরিক হয়ে বসে থাকছে; তারা সব গেল কোথায়? এদিকে ২০১১-র গণনায় দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমছে। ২০০১-এ জনগণনায় এই হার ছিল ২৯.৬ শতাংশ, ২০১১-য় তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দশকে কমে যাওয়ার হিসেব কষলে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের বৃদ্ধি যে হারে কমছে তার চেয়ে ৫০ শতাংশেরও বেশি হারে কমছে মুসলমানদের জনসংখ্যা। বৃদ্ধির হারের এই কমতি ১৯৮১-র গণনা থেকে দেখা যাচ্ছে টানা কমে আসছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ এই হার ছিল ৩২.৯ শতাংশ। ১৯৯১-২০০১-এ ছিল ২৯.৬ শতাংশ। ২০০১-২০১১-তে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ শতাংশ।

মুসলমান মহিলাদের মাথাপিছু গড় সন্তানের সংখ্যা ৩.১, আর হিন্দুদের ২.৭ এবং খ্রিষ্টানদের ২.৩টি। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ, অনুপ্রবেশ নয়। আবার মেয়েদের জীবনের গড় আয়ু কম হওয়া সত্ত্বেও যে মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিম্নমুখী, তাতে বোঝা যায়, এই অংশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। যতই শিক্ষার হার বাড়বে, মেয়েরা কাজের জগতে বেশী করে আসবে ততই এই হার আরও দ্রুত নামতে থাকবে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনসংখ্যার যে অংশের মধ্যে সচেতনতা এবং শিক্ষার হার কম সেই অংশের জন্মহার উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান এবং তা গড় হারের থেকে অনেক বেশি। ফলে, এর সঙ্গে ধর্মের বা অনুপ্রবেশের কোনও সম্পর্ক নেই।

আরও কয়েকটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রীয় মিথ্যচারের স্বরূপ চেনা যাবে। গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম– এই তিনটি রাজ্যের জন্য আপেক্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক হারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। যদি আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার শূন্যের ওপরে থাকে তাহলে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের থেকে বেশী আর যদি তা' শূন্যের কম হয় তাহলে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের থেকে কম। যদি খুব ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ হয় তাহলে সেই রাজ্যের জনসংখ্যা জাতীয় হারের থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। যদিও আমরা জানি, জনসংখ্যা বাড়লেই তা' যে অনুপ্রবেশের জন্যই তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৪১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনটি রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়েছে জাতীয় হারের থেকে বেশী হারে। এক্ষেত্রে একই সময়ে গুজরাটের জনসংখ্যাও বেড়েছিল, কিন্তু আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের থেকে কম হারে। গুজরাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে যদি আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই তাহলে নানান স্বাভাবিক কারণেও রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের থেকে বেশী হতে পারে।

বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আগমনের দু'টি বড় পর্য্যায় হল, ভারতের স্বাধীনতা-দেশভাগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে-পরেই ১৯৫১'র জনগণনায় দেখা যায় যে আসামে জাতীয় হারের চেয়ে বেশী হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও (১৯.৯%)। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু জাতীয় বৃদ্ধির (১৩.৩%) সঙ্গে প্রায় সমানই ছিল। এই বছর গুজরাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারও (১৮.৬৯%) অনেকটাই বেশী ছিল, জাতীয় বৃদ্ধি হারের তুলনায়। ১৯৬১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার (৩২.৮%), জাতীয় হারের (২১.৫%) থেকে অনেকটাই বেশী। ১৯৬১'র জনগণনায় আসামের দশকে বৃদ্ধি হারও ছিল অনেকটা বেশী প্রায় ৩৫ শতাংশ। এমন-কী গুজরাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আসাম বা বাংলার মত না-হলেও জাতীয় হারের থেকে বেশী ছিল (২৭%)। একই ভাবে আমরা যদি ১৯৭১'র জনগণনা দেখি তাহলেও দেখব আসামের জনসংখ্যা দশকে বৃদ্ধির হার (৩৫%) জাতীয় হারের (২৫%) থেকে বেশী। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই দশকে বৃদ্ধির হার বেশী (২৭%), কিন্তু আসামের মত অত বেশী নয়। সুতরাং, শরণার্থী অথবা অনুপ্রবেশ -কারীদের আগমনের এই পর্যায়েও জনসংখ্যাতে তার একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যাছে।

আমরা যদি আরও কিছু পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব ১৯৮১ থেকেই আসাম আর পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের থেকে কম এবং শেষ দুটি জনগণনাতে গুজরাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের থেকে বেশী। তাহলে কি বলা যাবে অনুপ্রবেশ গুজরাটেও হচ্ছে? এটা কী হতে পারে যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গকে করিডোর বা প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহার করে গুজরাটের মত অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে? যার ফলে গুজরাটের (বা তার মত অন্য রাজ্যের) জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে অনুপ্রবেশ ধরা পড়ছে না? ২০১১-তে গুজরাটের পরিযান পরিসংখ্যানটির দিকে তাকানো যাক। গুজরাটে, ২০০১ আর ২০১১ এর মধ্যে, কাজের সন্ধানে এসেছেন প্রায় সাড়ে ছ-লাখ মানুষ (৫,৩৪,৫৪৫ অন্য রাজ্যের গ্রাম থেকে আর ১,২২,২৪১ অন্য রাজ্যের শহরাঞ্চল থেকে)। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা যদি পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গুজরাটে গিয়ে থাকে তাহলেও তাদের ধরা আছে এই সাড়ে ছ-লাখের মধ্যেই। অন্যদিকে এই সময়ের মধ্যে গুজরাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৯৮,৬৭,৬৭৫। যদি কাজের প্রয়োজনে গুজরাটে আসা মানুষদের (যার একটা অংশ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলে লোকের বিশ্বাস) বাদ দিয়েও ২০০১ থেকে ২০১১ এর মধ্যে গুজরাটের জনসংখ্যাবৃদ্ধি হিসেব করা যায় তাহলে তা দাঁড়ায় ১৮.১৯ শতাংশ যা গুজরাটের প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১৯.২৮%) এর থেকে কম হলেও ২০০১-২০১১ সময়কালে ভারত (১৭.৭%), পশ্চিমবঙ্গে (১৩.০৮%) এবং আসাম (১৭.০৭%)-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে বেশী। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ঢুকে বাংলাদেশীরা অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে অন্য রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে— এই করিডোর বা প্রবেশদ্বার তত্ত্বের স্বপক্ষেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আবার যারা কাজের প্রয়োজনে বাইরের রাজ্য থেকে আসছেন তাঁরা সবাই যে অনুপ্রবেশকারী এমন-তো নয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের বাদ দিয়ে বিহার, উত্তর প্রদেশ, বা কেরালা থেকেও-তো বহু মানুষ যাচ্ছে গুজরাটে কাজের সন্ধানে যায়। তাহলে রাজ্যে বাইরে থেকে আসা কতজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী তা' জানার উপায় কী? যে বেআইনি ভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন সে-তো আর ঘোষণা করবেন না যে, আমি বাংলাদেশী! এই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করার জন্য জানা প্রয়োজন, কোন রাজ্যে কতজন বাংলাভাষাভাষী আছেন।

গুজরাটে ২০০১ সালে বাংলাভাষী লোক ছিলেন ৪০,৭৮০ আর ২০১১-তে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৯,৬৪৮। অর্থাৎ, ২০০১ থেকে ২০১১'র মধ্যে গুজরাটের জনসংখ্যায় বাংলাভাষীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪০,০০০। এই ৪০,০০০

এর মধ্যে তিন ধরণের বাংলাভাষী মানুষ আছেন- পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা বাঙালি, বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি আর গুজরাতে বংশানুক্রমে বাস করা প্রবাসী বাঙালি। এখন ৪০,০০০ এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এটা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কোনভাবেই ৪০,০০০ এর বেশী হতে পারে না। অর্থাৎ, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪০,০০০ এর থেকে কম হতে বাধ্য। ২০০১ থেকে ২০১১, এই ১০ বছরে গুজরাটের জনসংখ্যা বেড়েছে ৯৮,৬৭,৬৭৫। অর্থাৎ ২০০১-২০১১ এই সময়কালে, গুজারাটের জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাংলাভাষীদের অংশ মাত্র .০৬ শতাংশ। ২০০১-২০১১ মধ্যে গুজরাটের বাংলাভাষীদের সংখ্যাবৃদ্ধি যদি অনুপ্রবেশের জন্য হয় তাহলেও মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে তার অনুপাত খুবই সামান্য। অন্যদিকে, এটাও বলা যায়, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা-তো ছড়িয়ে যাচ্ছে নানা রাজ্যে। তাহলে শুধু গুজরাটের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখে লাভ নেই। এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্য কোনও রাজ্যে যাঁরা আসছেন তাদের কতজন বাংলাদেশী তার একটা হিসেব পাওয়া দরকার আর তারপর এই হিসেবটা বিভিন্ন রাজ্যের জন্য করে দেখা দরকার। পরিসংখ্যান বলছে অন্যান্য রাজ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতি সামান্য অংশই বাংলাভাষী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালের জনগণনায় কর্ণাটকে বাংলাভাষী ছিল ৪১২৫৬ যা ২০১১-তে বেড়ে হল ৮৭৯৬৩। সুতরাং এই ১০ বছরের মধ্যে কর্ণাটকের বাংলাভাষীর সংখ্যা বেড়েছে ৪৬,৭০৭ (যার মধ্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্কার, ম্যানেজমেন্ট কর্ম্মীরাও আছেন)। ওই একই সময়ের মধ্যে কর্নাটকের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৮২ লাখ (৮২,৪৪,৭৩৫)। অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২০১১ এঁর মধ্যে কর্নাটকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্র ০.৫৬ শতাংশ বেড়েছে বাংলাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। কাজেই, দেশ জুড়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের গল্পটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২০০৮ সালে হার্ভার্ড, ইয়েল এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপক গবেষণা করে দেখার চেষ্টা করেন যে দেশভাগের পরে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে পরিব্রাজনের চিত্র কেমন। তাঁদের গণনা বলছে, ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে গোটা ভারতে আগত মোট পরিযায়ী মানুষের সংখ্যা ৭৩ লক্ষ। আবার বহু মানুষ ভারত থেকে চলেও গিয়েছেন। অর্থাৎ, আমাদের শাসকেরা যে কোটি কোটি 'অনুপ্রবেশ'-এর গাল-গল্প শোনাচ্ছে, এই তথ্য তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত বই 'দি অ্যাগনি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ সাংবাদিক রণজিৎ রায় সংসদে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানান যে পূর্বপাকিস্তান থেকে ১৯৬০ সাল অবধি ভারতে আগত মানুষের সংখ্যা ৪১.১৭ লক্ষ, যাঁদের মধ্যে ৩১.২১ লক্ষ মানুষকে এই রাজ্যেই পুনর্বাসন দেওয়া হয় এবং বাকি প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে ভিন্‌রাজ্যে পাঠানো হয়। ১৯৭০ সাল অবধি পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা হয় ৫২.১৪ লক্ষ। এই উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই হিন্দু।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ১ কোটি উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। এঁদের অধিকাংশই স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পরে ফিরে যান বলে সরকার দাবি করে। ২০১১ সালের জনগণনার সময় পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ জানান যে তাঁদের জন্ম বাংলাদেশে। এঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশ (১১ লক্ষ) মানুষ নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। অনুমান করা চলে, তাঁরা মূলত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমান প্রধান জেলাগুলি যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশকে নিজের জন্মস্থান বলা মানুষের সংখ্যা নগণ্য। দেশভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু মানুষ এই রাজ্যে এসেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত অভিবাসীর সংখ্যা ২০০০ এবং ২০১৭ সালে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ এবং ৩৭ লক্ষ। আবার জনগণনা অনুযায়ী, জন্মস্থানের নিরিখে ভারতে (মোট) বাংলাদেশির সংখ্যা ২০০১ দশকে ৩৭ লক্ষ এবং ২০১১ দশকে ২৭ লক্ষ (মোট জনসংখ্যার ০.২২)। গত দুই দশক ১৯৯২-২০০১ এবং ২০০২-২০১১'য়, বাংলাদেশি অভিবাসী বৃদ্ধির সংখ্যা যথাক্রমে ২,৮০,০০০ জন এবং ১,৭২,০০০ জন। অতএব, জনগণনার হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা কমছে এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে অভিবাসী ফেরত যাচ্ছেন। অতএব, সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এখন ভারতে বাংলাদেশির সংখ্যা ২৭ লক্ষেরও কম এবং ১৯৯২-২০১১ (দুই দশকে) বাংলাদেশিরা ফেরত গিয়েছেন। সুতরাং, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং নতুন ভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশের যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের তথ্য, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত গবেষণাপত্র, রণজিৎ রায় প্রদত্ত সরকারি তথ্য এবং ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট জানাচ্ছে; পশ্চিমবঙ্গে কয়েক কোটি অনুপ্রবেশকারী আছে, এ কথাটি ডাহা মিথ্যা।

অনুপ্রবেশ নিয়ে যদি আমাদের দেশের শাসক-নেতারা সত্যিই উদ্বিগ্ন হতেন, তবে অনুপ্রবেশকারীদের ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতেন না। আসলে তাঁরা চিন্তিত অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরী করা নিয়ে। বাস্তবে অনুপ্রবেশ ইস্যুটি হল, বছরে ২ কোটি চাকরি কিংবা কালো টাকা উদ্ধার

করে সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার মতোই একটি মিথ্যাচার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীরা এদেশের যুব-সমাজের জীবন-জীবিকা গ্রাস করছে। এই পর্য্যবেক্ষণ সঠিক কী-না, তা' বুঝতে আমাদের দেশের কর্ম্মসংস্থানের হারের গতির দিকে তাকাতে হবে। জনগণনা অনুযায়ী, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১'র দশকে ভারতে কর্ম্মসংস্থানের হার ছিল যথাক্রমে ৩৫.৬৪ শতাংশ, ৩৭.১১ শতাংশ, ৩৯.১৩ শতাংশ এবং ৩৯.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ, গত তিন দশক ১৯৮১-১৯৯১, ১৯৯১-২০০১ এবং ২০০১-২০১১'য় কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১.৪৭%, ২.০২% এবং ০.৬৭%। ওই তিন দশকে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৩৫ শতাংশ, ২.১৫ শতাংশ এবং ১.৭৬ শতাংশ। অতএব, এটা পরিষ্কার যে ২০০১-২০১১ দশকে কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক কমেছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে মাত্র ৩৬৮টি পিওন পদের জন্য যে ২৩ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল, তার জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী? ত্প্যারিস ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুইলিটি ল্যাব প্রকাশিত গবেষণাপত্রে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে ভারতের এই বৈষম্যের ছবি বে-আব্রু করে দিয়েছে আরও। বলা হয়েছে, এই সময়কালেই এদেশের ওপর সারির ১ শতাংশের কবজায় রয়েছে আয়ের ২২.৬ শতাংশ এবং সম্পদের ৪০.১ শতাংশ অংশ।তএর জন্যও কী অনুপ্রবেশ দায়ী ? পরিসংখ্যান, গবেষণা ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে, না-না-না! লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে প্রকাশ্যে অনুপ্রবেশ নিয়ে মিথ্যাচার! এই মিথ্যাচারের উদ্যেশ্য, এন আর সি, সি এ এ , এন পি আর করে দেশের বৈধ নাগরিকদের বিতাড়ন। ভারতীয় নাগরিক অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে বাংলাদেশী বলে দাগিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে আদালতের চড় খেয়ে ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে। সমগ্র দেশবাসী যেদিন মিথ্যাচারের গালে চড় মারবে সেদিন মিথ্যাচারীরা পালাবার পথ পাবে না।

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা এবং ওয়েব সাইট

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস সুন্দরবনের মানুষেরা

কোয়েলী গাঙ্গুলি

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মৈপীঠ কুলতলি'র দেউলবাড়ি গ্রামে ৭ মার্চ, '২৬, এপিডিআর এবং গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস পালিত হল। সুন্দরবন লাগোয়া মাতলা আর ঠাকুরাণ নদীর গা ঘেঁষে কুলতলি ব্লকের গ্রামগুলির নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই জীবন এবং মৃত্যু গোটাটাই এই নদী আর জঙ্গল নির্ভর। সুন্দরবনের জঙ্গল আবাদ করে ওদের ঘর-বসতি। সকলেই নদীতে যায় মাছ, কাঁকড়া, মীন ধরতে। জঙ্গলে যায় মধু পাড়তে। বাঘ, কুমিরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত গলা জলে দাঁড়িয়ে মেয়েরা কাদারমধ্যে থেকে কাঁকড়া, মীন আর চিংড়ি তুলে আনে। এলাকার প্রায় আশি শতাংশ মেয়েই মৎস্যজীবী। তাই আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস মৈপীঠ-কুলতলির মৎস্যজীবী নারীদের অধিকারের দাবি জানানোর দিন।

নির্দিষ্ট করা সময় দুপুর একটা। সকাল থেকে তোড়জোরও চলছিল। হঠাৎই ফোনে জানানো হল অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বনির্ধারিত মাঠটিতে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া যাবে না। কারণ অজ্ঞাত! সেইসঙ্গে মোতায়েন করা হল একাধিক ডি আই বি। গ্রামবাসীরা কিন্তু এতেও পিছ-পা হলেন না। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে জায়গা করে দিলেন স্থানীয় মৎস্যজীবী অনাদি হালদার। তাঁর বাড়ির উঠোনে ত্রিপল টাঙিয়ে, মাইক লাগিয়ে ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঘন্টাখানেক দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হতেই দেখা গেল উঠোনে শ'খানেক মানুষ জড়ো হয়েছেন। দূরের গ্রামগুলো থেকে ভ্যানে করে মেয়েরা-তো এসেছেনই, উল্লেখযোগ্য হল নামখানা থেকে ভোররাতে রওনা দিয়ে এসে হাজির হয়েছেন জনা চারেক বিভিন্ন বয়সের মহিলা। এসেছেন স্থানীয় সাংবাদিক বাবলু হাসান নস্কর। এই উৎসাহ, আগ্রহ এবং অবশ্যই সাহসকে কুর্ণিশ না-জানিয়ে উপায় থাকে না।

এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ-এর স্বাগতভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই তাঁদের প্রতিদিনের জীবন জীবিকার সমস্যা, অভাব, অভিযোগ, বন দফতরের অত্যাচার, এইসব বিষয়গুলিকে তুলে ধরার আহ্বান জানান। এরপরে নেহা নস্করের গানে লালনের খাঁচার ভিতর অচিন পাখির সুর ভেসে

যায় মানুষ, নদী আর জঙ্গল পেরিয়ে আরও দূরে। চন্দনা নস্কর বলেন, ''আমরা এখানে আমাদের নিজেদের কথা বলতে এসেছি। আমাদের অধিকারের কথা আমাদের নিজেদেরকেই বলতে হবে। এখনও নারী পুরুষে মজুরির বৈষম্য রয়েছে। আসলে আমাদের অধিকারের দাবি বিশেষ কোনও দিনে সীমাবদ্ধ নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের দাবি। আমরা জানি কম, তাই বলতে পারি কম। জানার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এই এলাকায় ঠিকমতন স্কুল কলেজ নেই। এলাকার শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও উন্নত করতে হবে। মেয়েদের মাসিক রজস্রাব যা একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় তাকেও আমাদের লুকিয়ে রাখতে হয়। কোনও সমস্যা হলে চিকিৎসার সুযোগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেলে না। আমাদের মেয়েদের লড়াই, আসলে লড়াইয়ের রোজনামচা।''

নামখানা থেকে আসা অণিমা মাঝির ভাই গেছিল গুজরাটে কাজ করতে। ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীর হাতে ধরা পড়ে এখন পাকিস্তানের জেলে। মালিকও কোনও দায়িত্ব নিচ্ছে না। পাকিস্তানের জেলের খবর ওরা পাবেন কী-ভাবে? বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি জায়গায় ঘুরেছেন। কোথাও কোনও ভরসা মেলেনি। ভাইকে কী-ভাবে জেল থেকে মুক্ত করবেন কোনও দিশা জানা নেই। এপিডিআর-এর কাছে আবেদন করলেন এ-বিষয়ে যদি কিছু করা যায়। তাঁর প্রশ্ন, ''আমার বৃদ্ধা মা কি তার ছেলেকে আর কোনও দিনই দেখতে পাবে না? আমি কি আমার ভাইকে এদেশে ফিরিয়ে আনতে পারব না?''

অণিমা মাইতি, ভারতী শিউলি, পার্বতী হালদার প্রত্যেকেই তাদের প্রতিদিনকার জীবিকার লড়াই এবং সেই সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে কথা বলেন। নারী পুরুষ সকলেই একসঙ্গে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে নদীতে যায় মাছ কাঁকড়া চিংড়ি ধরতে। এখানে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমির তো বটেই, তবে জলেও বাঘ আছে। আর ডাঙ্গায় বাঘের সঙ্গে বাড়তি রয়েছে বনদফতরের কর্মীরা। তারা মাছ কেড়ে নেয়, জাল কেড়ে নেয়, নৌকা আটকে রাখে, নৌকার মোটর খুলে নেয়, তার সঙ্গে থাকে জরিমানা এবং শারীরিক নির্য্যাতন। আর কে-না-জানে মেয়েদের ওপর শারীরিক নির্যাতন সব থেকে সহজ কাজ। এমন কী শুকনো কাঠকুটো ঘাস-পাতা যা আইনত'ই গ্রামবাসী আনতে পারে তাও ওরা আনতে দেবে না।

এখন আবার কোর এলাকা বাড়িয়ে বাফার এলাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে জঙ্গলে ঢোকাই কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু মানুষের পেট-তো কোর, বাফার জানে না। তার আছে খিদে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বেড়েছে। ফলে বাঘে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। কলকাতা আনতে-আনতে রক্তক্ষরণেই মারা যান অধিকাংশ মানুষ। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে প্রশাসনিক অসহযোগিতা, বনদফতরের মিথ্যাচার, মৃত্যুর ঘটনা অস্বীকার এতকিছু পার করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা প্রায় অসম্ভব। এমন-কী বাঘ গ্রামে ঢুকে গবাদি পশু হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ-তো দেয়ই না উল্টে বাঘ তাড়ানো, জাল মেরামতে করা ইত্যাদি কাজগুলিও করিয়ে নেয় তাদের প্রাপ্য মজুরি না-দিয়েই।

বনদফতরের এই সমস্ত জুলুমবাজির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে এপিডিআর-এর সহযোগিতায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে ২০২৩ সালে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পেরেছেন বাঘের আক্রমণে নিহত লখাই নস্করের স্ত্রী শান্তিবালা নস্কর সহ বেশ কয়েক জন। কিন্তু ওদের প্রশ্ন, ''ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করতে হবে কেন? এ-তো আমাদের প্রাপ্য। মামলা করার টাকা পাব কোথায়?'' পার্বতী হালদারের স্বামী তাপস হালদারও বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন। পার্বতী হালদারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোর্টের দ্বারস্থ না হয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পেরেছেন।

মহিমা মন্ডলের স্বামী আবুর আলি মন্ডলকে ২০২৪ সালে গাঙে মাছ ধরতে গেলে বাঘে তুলে নিয়ে যায়। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক সপ্তাহ পরে বনদফতরের অনুসন্ধানী টিম যায়। যথারীতি মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাতদিন পরে পাওয়া সম্ভবও নয়। ফলে, প্রমাণ নেই বাঘে নিয়েছে এই অজুহাতে ক্ষতিপূরণ মেলেনি। তিনটে বাচ্চা নিয়ে মহিমা এখন অথৈ জলে। ''আমি বাঁধের গায়ে চরের জমিতে বাস করি। আমার কোনও জমি নেই। বাচ্চাদের একলা ঘরে রেখে কোথায় কাজ করতে যাব?'' প্রশ্ন মহিমার। স্থানীয় সাংবাদিক বাবলু হাসান নস্কর বলেন, ''এপিডিআর-এর সদস্যদের নেতৃত্বে তাপস হালদারের দেহ বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের ছবি এখনও আছে আমার কাছে।'' এবং এই কারণেই বনদফতর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা-তো বার বার ঘটে না।

বাঘ, কুমীরের সঙ্গে নতুন আর-এক বিপদ কাঠের বাক্স। এ-হল আসল মৌচাকের বদলে মৌমাছি জোটানোর ফাঁদ। এই কাঠের বাক্সের মৌচাকে ঢিল পড়ছে টের পেতেই ওদের এই সভা নিয়ে এত মাথা ব্যথা। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা বনদফতরের সঙ্গে চুক্তি করে জঙ্গলের মধ্যে গাছে গাছে এই কাঠের বাক্স বসিয়ে যাচ্ছে। আর বনদফতর মৌলেদের জঙ্গলে যাবার মহুল পাস ১৫ দিন করে তিন দফায় ৪৫ দিনের বদলে একদফায় ১৫ দিন করে দিয়েছে। মৌলেদের এখন মাথায় হাত। খাবে কী? একে-তো ওই নকল মধুর দাম অনেক কম হবে।

তারপরে মরসুমে মাত্র একবার জঙ্গলে গেলে পেট চলবে কেমন করে? শেষ সংযোজন এপিডিআর-এর এই সভা হবার দিন তিন-চারেকের মধ্যেই অনাদি হালদার বনদফতরের একটি নোটিশ পান। তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি মৎস্য চাষের অভিযোগ আছে। যা সর্বৈব মিথ্যা। অর্থাৎ ওরা ভয় পেয়েছে। তাই পালটা ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের এই এককাট্টা লড়াইকে কী এভাবে দমানো যায়? যায় না।

এপিডিআর-এর সহ সভাপতি রঞ্জিত শূর বলেন, যে মানুষেরা লড়াই করেন আমরা তার পাশে থাকি। সবাই মিলে একজোট হয়ে লড়াই করলে দাবি আদায় অনেক সহজ হয়ে যায়। ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস। মৎস্যজীবী বলতে মানুষ সাধারণত পুরুষদের কথাই ভাবেন। কিন্তু এখানে মহিলারাও নিয়মিত নদীতে মাছ, কাঁকড়া, মীন ধরতে যায়। ফলে মৎস্যজীবীদের সমস্যা মানে মহিলা মৎস্যজীবীদেরও সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা, বিএলসি পাস। নদীতে মাছ ধরতেও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। হয় বিএলসি পাস তুলে দিতে হবে; না-হলে ইচ্ছুক সকলকে বিএলসি পাস দিতে হবে। তৃতীয়তঃ, মধুর বাক্স বসানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং তিন দফায় ৪৫ দিনের ব্যবস্থা পূনর্বহাল করতে হবে। বাঘের আক্রমণে, কুমিরের আক্রমণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। নামখানার যে মৎস্যজীবী গুজরাটে ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়ে তিন বছর পাকিস্তানের জেলে বন্দি রয়েছেন আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকতে চেষ্টা করব।

আলোচনার শেষে সকলে ব্যানার, পোষ্টার এবং একটি দাবিপত্র নিয়ে মিছিল করে স্লোগান দিতে-দিতে এলাকার বেশ কিছু রাস্তা পরিক্রমা করে।

দাবিপত্রের দাবিগুলি:

১) বিএলসি পাশ বন্ধ করে মৎস্যজীবীদের নদী থেকে উৎখাত করার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

২) বাঘের আক্রমণে মৃতের পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ১০ লক্ষ টাকা সহ বনদফতরে চাকরি দিতে হবে।

৩) জঙ্গলের মধ্যে মধু সংগ্রহের জন্য কৃত্রিম বাক্স বসানো বন্ধ এবং মহুল পাশ তিন দফায় দিতে হবে।

৪) বছরে তিন মাস নদীতে নামা বন্ধ থাকার সময়ে মৎসজীবীভাতা চালু করতে হবে।

৫) মৎস্যজীবীদের জন্য নদীতে ভাসমান এ্যাম্বুলেন্স সহ মডেল হাসপাতাল চালু করতে হবে।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

(একাদশ কিস্তি)

(যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে; যদিও এই রিপোর্ট জনসমক্ষে আসেনি।

২০২৬-এর ৩১ মার্চ, মাওবাদী মুক্ত ভারত গড়বেন বলেছেন, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই পত্রিকা যখন প্রকাশ হচ্ছে সেই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওবাদী মুক্ত ভারত দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। ২০০৮ সালে এই রিপোর্ট যখন পেশ হয় সে সময়কার ছত্তিশগড় সমেত মধ্য ভারতের একইরকম দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কোনও পরিবর্তন ২০২৬ সালের মার্চের শেষেও হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয়ছে এই রিপোর্টের প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি।)

Investigating the people's discontent and support for extremist

কারণ অনুসন্ধান—

মানুষ কেন ক্ষুব্ধ হয় এবং চরমপন্থার প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেয়

অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার উত্থানের পিছনে প্রকৃত কারণগুলি বিশ্লেষণ করার সময় এখানে নির্ভর করা হয়েছে পুরানো সমস্ত সরকারি রিপোর্ট, চরমপন্থীদের প্রকাশনাগুলি থেকে উঠে আসা তথ্যাবলী, মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করে চলা গোষ্ঠীগুলির রিপোর্ট সমূহ, এই বিষয়ে পর্যবেক্ষকদের প্রকাশিত পুস্তকাদি, সংবাদ জগৎ পরিবেশিত সরেজমিন অনুসন্ধান জনিত তথ্যাবলী এবং তার ভিত্তিতে আমাদের অনুসন্ধান টিমের বিশেষজ্ঞ সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনার ওপর।

এই অনুসন্ধান ও আলোচনাগুলি থেকে যা উঠে এসেছে তার সারাংসার হিসেবে বলা যায়— এই অসন্তোষ— ইত্যাদির কারণসমূহের উৎস বহুবিধ। কারণ, এক-এক জায়গার সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এক-এক রকম।

তার সঙ্গে জুড়েছে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা কাঠামোগত সমস্যাগুলো দূর করতে পারার কোনরকম কার্য্যকরী ব্যবস্থার ধারাবাহিক অনুপস্থিতি এবং স্বাধীনতার সময় থেকে ও বিশেষ করে ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ঠিকঠাক কাজের বদলে সমানে অকার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া এই সবই অসন্তোষ ও অশান্তির উৎস। নকশালবাদী চরমপন্থী আন্দোলন সহ নানা ধরণের জন-অসন্তোষ, উদ্ভূত আন্দোলন সংগ্রাম শুধুমাত্র দুর্গম জঙ্গল-পাহাড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা' সন্নিহিত সমতলভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এই আন্দোলন গুলি শুধুমাত্র তথাকথিত সুখা অঞ্চলেই অর্থাৎ যেখানে বারবার ফসলের উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে, যথেষ্ট ফসল পাওয়া যায় না, সেই সব জায়গাতেই আটকে আছে এমন নয়। বরং বিপরীতে বিহারের মত যথেষ্ট সেচবহুল রাজ্যেও এই আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় এইরকম আন্দোলনগুলির বিস্তৃতির কারণ বহুবিধ ও জটিল।

অসন্তোষ ও অশান্তির ক্রমবর্দ্ধমান তীব্রতা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে আন্দোলনকারীদের চরমপন্থা অবলম্বন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দিকে সশস্ত্র পদ্ধতিতেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সমস্যা মেটানোর পন্থা গ্রহণও বহুদিনের সঞ্চিত ও না মেটাতে পারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গুলির জবাব হিসেবেই দেখা দরকার। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, প্রশাসন সমস্যা সমাধানে তখনই কাজ করে এবং তখনই সেই উদ্দেশ্যে অগত্যা কোনও নীতি প্রণীত হয় যখন আন্দোলন হিংস্র হবার পথ গ্রহণ করে; অন্যথায় নয়।

সম্প্রতি, ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দু'টি শক্তিশালী নকশাল পন্থী ধারার সংহতি ও সম্মিলনে উদ্ভুত সি পি আই (মাওবাদী) দলটির উত্থান এই পরিস্থিতিতে নবতম মাত্রা যোগ করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই এই দলটির উত্থানের ঘটনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিকেও এই চরমন্থাকে সরকার কী চোখে দেখছে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। মানুষের কাছে দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র এবং 'উগ্রতর' এক রেডিক্যাল সংগঠনের পরস্পরকে বুঝে নেওয়া এবং কীভাবে তার 'আইনি-নিষ্পত্তি' করা হবে তারই একটি নমুনা হাজির করা হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে এর যা প্রভাব পড়েছে তাকে এক কথায় বলা যায়-গণতান্ত্রিক পরিসরে ও পারস্পরিক গণতান্ত্রিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরে বহুদিনের পুরোনো সমস্যাগুলি দূর করার জন্য বহুদিন ধরে যে ধাঁচার প্রকরণগুলি বিদ্যমান তার কোনোরকম উন্নতি সাধনের উপায় কিছু বেরোয় কী-না তা কোনোভাবেই যথোচিত গুরুত্ব পেল না। এই জটিল সমস্যাটির মর্ম বস্তু খুঁজতে হবে এখানেই।

সরকারের দিক থেকে এই ভাবনাটি প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে সরকারের কার্য্যধারাকে পর্য্যালোচনা করার পক্ষে পর্য্যাপ্ত-তো নয়ই; এমন-কী যথেষ্ট তথ্যভিত্তিকও নয়। নকশাল আন্দোলনের উদ্ভবের উৎস সন্ধানের ইতিহাসে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটা অবশ্যই বলা দরকার যে, বহু-বহু সংখ্যক নকশাল পন্থী পার্টি বা গ্রুপ বিদ্যমান যাদের নিজেদের মধ্যে জনগণকে সংগঠিত করা, তাদের 'action'-এ জনগণকে শামিল করা, সশস্ত্র আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাডার রাখা—ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে; যদিও তারা প্রত্যেকে এই তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান যে আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটানোর পূর্ব শর্ত হলো ভারতীয় রাষ্ট্রকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করণ। তাদের কারও-কারও প্রতিনিধি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে এমনকি বিধানসভার মতো নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানেও পৌঁছেছেন। আমাদের এই রিপোর্ট যখন 'বিশৃঙ্খলা (Unrest)' বিষয়টি নিয়ে পর্য্যালোচনা করে তখন সেই বিশৃঙ্খলা (Unrest) মানে, শুধু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুলিশ থানা উড়িয়ে দেওয়াক্ষ্মর মত ঘটনাকেই বোঝায় না; তা ব্যাপক জনগণের অভ্যুত্থানকেও বোঝায়। শুধু বিহারেই নয়, দেশের সর্বত্রই জঙ্গি প্রতিবাদ আন্দোলনে ব্যাপক জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নকশাল পন্থী আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেভাবে Unlawful Activities (Prevention) Act প্রয়োগ করে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য মাওবাদী দল এবং তাদের গণসংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করেছে এবং ঘোষিত এবং অঘোষিত কায়দায় যেভাবে পুলিশ অন্য নকশাল পন্থী সংগঠন গুলির কাজকর্ম্মেও নিষেধাজ্ঞা জারি করছে তা'তে দৃশ্যতই ওইরকম গণসমাবেশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তা'তে করে এই রিপোর্ট যে-যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে ওয়াকিবহাল সেইসব ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বন্ধ হয়ে গেছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।

https//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা, অনুপযুক্ততা এবং অবিচার কীভাবে নকশালপন্থী কার্য্যকলাপের উপযুক্ত ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করছে। এই বিশ্লেষণ ও এই বিস্তৃত বিবরণ মানুষকে বুঝতে ও মানতে সাহায্য করবে যে; কেন নকশালপন্থীরা সমর্থন পায়। এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য এটা দেখা যে সরকার কীভাবে সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে আইনি পথে এই বিশৃঙ্খলা (Unrest)-এর প্রকৃত কারণগুলিকে

নির্মূল করে সংবিধান ও আইনকে মান্যতা দেওয়া শাসন প্রক্রিয়ার (Governance) মাধ্যমে ভুক্তভোগী মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

এটাও ঠিক যে নকশালপন্থীরা এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলায় যে হিংসার আশ্রয় নেয় তা আবার অন্যভাবে সাধারণ জনজীবনে ক্ষত ত্রাস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। এটাও সত্যি যে নকশাল পন্থী কার্য্যকলাপ শুধু জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা মোচনেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা সহিংস পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে দখল ও উচ্ছেদের সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রাম অবশ্যই এর নিজস্ব কারণে ঘটা ক্ষত ও বিপর্যয়ের বিপরীত ফলের জন্য দায়ী। আমাদের এই রিপোর্ট কোনও-কোনও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ও কোনও-কোনও বিষয়কে করে না; তার যোগসূত্র নিহিত আছে এই সার সত্যের মধ্যে যে, এই রিপোর্ট সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যা ও চাহিদাগুলির একটি সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে পেতে চাইছে, যে-সমস্যা ও চাহিদাগুলি ধরেই নকশালপন্থীরা জনগণের মধ্যে থেকে সমর্থন আদায় করতে চাইছে।

Land related factors (যে সমস্যা ভূমি কেন্দ্রিক)

বহুল প্রচলিত, 'যে চাষ করে জমি তার', স্লোগানটি অনুপস্থিত জমিদার তন্ত্র থেকে উদ্ভূত যেখানে ফসল ফলানোর কোনও ধাপে কোনও প্রক্রিয়ায় না-থেকেও এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র অবদান ছাড়াই জমির মালিক ফসলের সিংহভাগ আত্মস্থ করতো। স্বাধীনতা পূর্ব আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দাবি ছিল, যে লাঙ্গল ঠেলে জমির মালিকানা তারই হতে হবে এবং স্বাধীন ভারতে সরকার এই দাবির প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। অনুপস্থিত জমিদার বাবুরা আজও আছেন কিন্তু আজকের জমি-সম্পর্ক অনেক অনেক বেশী জটিল। তাই যদিও 'চাষীর হাতে জমি চাই', এই আকাঙ্ক্ষা আজও বিদ্যমান, নকশাল পন্থী আন্দোলনের অভিমুখ আজ ভূমিহীনদের হাতে জমিদার বা সরকারের জমি তুলে দেওয়া। জমিদারের হাত থেকে জমি দখল করার ক্ষেত্রে নকশাল পন্থীরা আইনের ধার ধারে না। তারা শুধু জমিদারদের সিলিং উদ্বৃত্ত জমি ছিনিয়ে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয় তাই নয়; বরং তাদের চোখে পড়া অনেক জমির মালিক বা অন্যভাবে আগ্রাসী বা নিষ্ঠুর অথবা নকশাল আন্দোলনের উগ্র বিরোধী— সবাই'ই তাদের লক্ষ্য। এমনকী তারা যদি বড় জমিদার না'ও হয় তবুও। এইরকম জমির মালিকদের বহু ক্ষেত্রে তাদের জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে তাদের গ্রাম থেকে উৎখাত করা হয়েছে। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে সশস্ত্র নকশালপন্থীদের নেতৃত্বে গরিব মানুষেরা দল বেঁধে মিছিল করে জমিতে গিয়ে লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আবার পুলিশ এসেছে, ওইসব ভূমিহীন গরীব মানুষদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মকদ্দমা দিয়েছে এমন-কী TADA অথবা POTA'র মত আইনের ধারাও (যখন সেই আইন গুলো বলবৎ ছিল) দিয়ে দিয়েছে। এবং ওই গরিব মানুষেরা জবর দখলকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আর তারা যাতে কোনমতেই ওই জমি ভোগ করতে না-পারে পুলিশ তা সুনিশ্চিত করেছে। যেখানে যেখানে জমির মালিক এতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে জমিতে আর ফিরতে পারেনি সেই সব ক্ষেত্রে ওই জমিগুলি চাষ না-হওয়া অবস্থায় অনাবাদি হিসেবে পড়ে থেকেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের কোনও কোনও অংশে এমন ঘটনা ঘটেছে যদিও ঠিক কত পরিমান জমি এইরকম অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে তার কোনও সামগ্রিক হিসেব করে ওঠা সম্ভব হয়নি কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে বিশেষ করে ওয়ারেঙ্গেল, করিম নগর এবং আদিলাবাদ জেলায় হাজার হাজার একর জমি এইভাবে চাষ না-হওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। এমনও ঘটেছে যে বহু ক্ষেত্রে পূর্বতন জমির মালিক স্বেচ্ছায় চাইছে যে তার নিজের জন্য কিছু জমি রেখে দিয়ে মাওবাদীদের দাবি মত বাকি জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ব্যবস্থা নিক। কিন্তু সরকার তাতে রাজি নয়, কারণ এতে না-কী ''--- দেশে আইন-কানুন বলে কিছু নেই'', এই ভাবনায় সিলমোহর দেওয়া হবে। এই কারণে, এইভাবে হাজার হাজার একর জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকছে। যেখানে জমির মালিক আবার জমি পুনর্দখলের জন্য প্রস্তুত যেমন বিহারের বেশীরভাগ অংশে হচ্ছে সেক্ষেত্রে জমি পুনর্বন্টনের জন্য নকশালপন্থীদের এতদিনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

ক্রমশ

'মাওবাদী মুক্ত ভারত'—এই ঘোষণার অর্থ কী?

সন্দীপ সাহা

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের মন্দির বলে কথিত লোকসভায় সম্প্রতি এক অভূতপূর্ব নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৩০ মার্চ, ২০২৬, ঘোষণা করলেন যে, ভারত মাওবাদী মুক্ত হয়েছে, তখন শাসক দল বা বিরোধী; কোনও পক্ষ থেকেই বড় ধরণের কোনও প্রশ্ন বা বিতর্কের অবতারণা করা হয়নি। অথচ এই ঘোষণার সমান্তরালে ছত্তিশগড়ের বস্তার, বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া এবং ঝাড়খন্ড, উড়িষার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চলছে ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম

সামরিক অভিযান— 'অপারেশন কাগার'।

কংগ্রেস আমলের 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' থেকে শুরু করে বর্তমানের 'অপারেশন কাগার', নাম পাল্টালেও কৌশল বদলায়নি। 'অপারেশন কাগার', মূলত মাওবাদীদের শেষ দুর্গ হিসেবে পরিচিত বস্তার-অবুঝমাড় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে উড়িষা এবং ঝাড়খন্ডের পাহাড়-জঙ্গল এলাকাও লক্ষ্য। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে এই অভিযানে মাওবাদী নিধনের সংখ্যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে। ২০২৪ থেকে ২০২৬-এর শুরু পর্যন্ত বেসরকারি মতে অন্তত ১৩০০ জন কথিত মাওবাদী নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। শত শত রাজনৈতিক ও গণ-আন্দোলনের কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছে। শুধুমাত্র এপ্রিল ২০২৪-এর একটি তথাকথিত এনকাউন্টারেই ২৯ জন মাওবাদীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

এই সংখ্যাতত্ত্বের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভয়াবহ মানবিক প্রশ্ন। মানবাধিকার কর্ম্মীদের দাবি, নিহত রাজনৈতিক কর্ম্মীরা ছাড়াও মারা গেছেন বহু সাধারণ আদিবাসী। মারা গেছেন বেশ কিছু পুলিশ ও আধা সামরিক কর্ম্মীও। তালিকায় বড় একটি অংশ সাধারণ আদিবাসী ও 'মাওবাদী'-কে এনকাউন্টারের নামে ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যা করা হয়েছে বলে বহু মানবাধিকার সংস্থা অভিযোগ জানিয়েছে। সংবিধান, বিচারব্যবস্থা ও বিনা বিচারে হত্যা' ভারতের সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রতিটি নাগরিকের জীবনের অধিকার এবং আইনের শাসন (Due process of law) নিশ্চিত করে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বস্তার সহ মাওবাদী এলাকাগুলিতে সংবিধান যেন এক দূরের স্বপ্ন। রাষ্ট্রেরও যেন কোনও দায় নেই সংবিধান মেনে চলার।

বিনা বিচারে হত্যা অভিযোগ উঠেছে, গ্রেপ্তার করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা বাহিনী সরাসরি গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের দাবি, ভুয়ো এনকাউন্টারে বহু সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে।

নারীদের অবস্থান মাওবাদী ক্যাডারদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। মৃতদের মধ্যেও প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলা। কিন্তু নিহতের তালিকায় থাকা নারীদের নিয়ে অভিযোগ আরও গুরুতর। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর রিপোর্টে বারবার উঠে এসেছে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আদিবাসী নারীদের যৌন হেনস্থা ও শারীরিক নির্য্যাতনের কথা। ভূয়ো সংঘর্ষে নিহত নারীদের মাওবাদী উর্দি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কী না, তা' নিয়ে বহুবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সমাজকর্ম্মীরা।

যদি রাষ্ট্রের ঘোষণা অনুযায়ী দেশ মাওবাদী মুক্ত হয়েই থাকে, তবে এখনও কেন হাজার হাজার আধা-সামরিক বাহিনী, ড্রোন এবং আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে গভীর জঙ্গলে অভিযান চালাচ্ছে? এই স্ব-বিরোধিতা প্রশ্ন তোলে এটা কি পরিকল্পিত 'গণহত্যা'?

জল-জমি-জঙ্গল 'মাওবাদী সমস্যা'র মূলে রয়েছে খনিজ সম্পদ ও বনাঞ্চল দখলের লড়াই। ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িষার এই 'লাল করিডোর', আসলে ভারতের সবথেকে ধনী খনিজ অঞ্চল। লোহা, কয়লা, বক্সাইট ও টিনের লোভে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর নজর এখন আদিবাসীদের ভিটেমাটির ওপর। মাওবাদীরা আদিবাসীদের সশস্ত্র করে সেগুলি রক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারত রাষ্ট্র চাইছে উন্নয়নের নামে সেগুলিকে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে।

লুটপাটের অর্থনীতি আদিবাসীদের কাছে জঙ্গল ও জমি শুধু সম্পদ নয়, তাদের অস্তিত্ব। যখন রাষ্ট্র উন্নয়ন বা মাওবাদী দমনের নামে গ্রাম উচ্ছেদ করে খনি কোম্পানিগুলোকে জমি লিজ দেয়, তখন আদিবাসীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। রাষ্ট্র আধা সেনার ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে আদিবাসী গ্রামগুলোকে নজরবন্দি করা এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে এবং তার মধ্য দিয়ে কর্পোরেট সংস্থাগুলির রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বর্তমান অবস্থা ও আগামীর সম্ভাবনা: বর্তমানে মাওবাদী আন্দোলনের সাংগঠনিক শক্তি আগের চেয়ে ভীষণ দুর্বল হলেও তার আদর্শ ভিত্তিক কর্ম্মপন্থা শেষ হয়ে যায়নি। অমিত শাহর ঘোষণা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ হলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন।

বাস্তব চিত্র মাওবাদী শীর্ষ নেতৃত্ব হয়তো অনেকটা কোণঠাসা, কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে ক্ষোভ বাড়ছে। সরকারের 'সারেন্ডার পলিসি'র মাধ্যমে অনেক ক্যাডার তথাকথিত মূলস্রোতে এলেও তাদের সঠিক পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

ভবিষ্যৎ: ইতিহাস সাক্ষী দেয়, বন্দুকের নলে কোনও আদর্শকে, গণ-আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করা যায় না। যতক্ষণ না তার মূল কারণ (আর্থ-সামাজিক বৈষম্য) সমাধান হচ্ছে কোনও-না-কোনও ভাবে তা' ফিরে আসবেই। রাষ্ট্র যদি কেবল সামরিক জয়কেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে, তবে ভবিষ্যতে এই ক্ষোভ আরও বড় কোনও বিস্ফোরণের জন্ম দিতে পারে।

উপসংহার: সরকার বলছে দেশের বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকা 'মাওবাদী মুক্ত' করা মানে না-কী আদিবাসীদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেওয়া। কিন্তু এটা কী তাঁদের সংবিধানসম্মত অধিকার

ফিরিয়ে দেওয়া? সেরকম কোনও লক্ষণ'ই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, যদি এই মুক্তির অর্থ হয়, আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে অরণ্যের খনিজ সম্পদ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া; তবে এই শান্তি হবে শ্মশানের শান্তি।

'অপারেশন কাগার', আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অন্যদিকে মানবাধিকার ও আদিবাসী জনজীবনের অস্তিত্ব। সংসদের নীরবতা হয়তো সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু জঙ্গলমহলের নিস্তব্ধতা আগামীর ঝড়ের ইঙ্গিত হতে পারে। বন্দুকের নল শেষ কথা নয়। সংবিধানের পঞ্চম তফশিল কার্যকর করে আদিবাসীদের হাতে তাদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই শান্তি নিহিত আছে। অপারেশন কাগার বন্ধ হোক।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী প্রচার আন্দোলন (ক্যাম্পেইন এগেইন্সট স্টেট রিপ্রেশন)'র সংগঠনগুলি মিলিত হয়ে অধিকার আন্দোলনের কর্ম্মীদের অপহরণ করে নৃশংস অত্যাচার চালানো দিল্লী পুলিশ'র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছে। মানবতা বিরোধী, অসাংবিধানিক, গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না-করে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই সেভাবে প্রচারিতও হয়নি। তারই প্রয়াস নিম্নের এই প্রতিবেদন—

শ্রমিক-অধিকার কর্ম্মী, ছাত্র-আন্দোলন কর্ম্মী এবং উচ্ছেদ বিরোধী সামাজিক আন্দোলন কর্ম্মীদের অপহরণ করে তারপর বে-আইনিভাবে আটক করে তাঁদের উপর নৃশংস শারীরিক নির্য্যাতন চালিয়েছে দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানায় ক্যাম্পেইন এগেইন্সট স্টেট রিপ্রেশান (সি এ এস আর)। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা আন্দোলন-কর্ম্মীদের উপর এই নিপীড়নের ঘটনা আসলে গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং ন্যায় বিচারের উপর একটি ভয়াবহ আঘাতের উদাহরণ।

গত ১২ মার্চ ২০২৬, দিল্লীর দয়াল সিং কলেজের প্রবেশদ্বারের সামনে থেকে শ্রমিক অধিকার কর্ম্মী শিব কুমার এবং ছাত্র-আন্দোলন কর্ম্মী ইলাক্কিয়া-কে অপহরণের কায়দায় তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে দিল্লী পুলিশ। দেশের নাগরিকদের মৌলিক, আইনি এবং সাংবিধানিক অধিকারকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে এই বেআইনিভাবে অপহরণ এবং আটক করা হয়েছে।

শিব কুমারের উপর শারীরিক নিপীড়নঃ অপহরণ করে তুলে আনার পর শিব কুমারের উপর শুরু হয় লাগাতার শারীরিক নির্য্যাতন ও যৌন উৎপীড়ন। তাঁর নিজের কোমরের বেল্ট খুলে নিয়ে সেটি দিয়েই তাঁকে প্রহার করা হয়, বেল্টের ধাতব অংশটি দিয়ে তাঁর যৌনাঙ্গে আঘাত করা হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা যাবৎ তাঁকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাবারের ব্যাটন দিয়ে শরীরের নিম্নাংশে লাগাতার আঘাত করা হয়। দিল্লী পুলিশের অফিসাররা তাঁর দাড়ি ধরে টেনে তুলে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখে। তারপর বুট দিয়ে তাঁর পা' মাড়িয়ে নির্য্যাতন করে। যতক্ষণ তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল, তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সেই অবস্থায় তাঁকে লাগাতার নিগ্রহ করা হয়। শিব কুমারের বেআইনি আটক ও অপহরণকে ধামাচাপা দিতে তাঁর মাথায় বন্দুক ধরে দিল্লী পুলিশ তাঁকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে যে, তিনি সেই সময়টা আত্মগোপন করে ছিলেন। স্বীকারোক্তি না-দিলে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

শিব কুমার ও তাঁর সঙ্গে আটক রুদ্রকে একই ঘরে নগ্ন করে পরস্পরের সামনেই জঘন্য কায়দায় যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক নির্য্যাতন চালানো হয়। শিব কুমারকে দিয়ে জোর করে আর-এক বন্দিকে প্রহার করতে বাধ্য করা হয়।

মঞ্জিতকুমার কে অপহরণ করে নির্য্যাতনঃ শিব কুমারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং মজদুর অধিকার সংগঠনের শ্রমজীবী-কর্ম্মী মঞ্জিত কুমার যখন ঐ একই দিনে ভীমা কোড়েগাঁও মামলায় দীর্ঘদিন আটক আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডলিং'র মুক্তির দাবিতে কর্ম্মসূচী সেরে ফিরছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে একই কায়দায় অপহরণ করে আটক করে দিল্লী পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। হেফাজতে নেওয়ার পর তাঁকেও একইভাবে নগ্ন করা হয়। তারপর উপুর করে শুইয়ে নির্য্যাতনকারী অফিসাররা তাঁর কোমরের উপর চেপে বসে তাঁর পায়ের পাতায় প্রহার শুরু করে। মনজিতের দলিত পরিচয় জানতে পেরে অফিসাররা তাঁর জাত তুলে অপমান শুরু করে এবং নগ্ন অবস্থায় তাঁকে দিয়ে ঘর পরিস্কারের কাজ করানো হয়। একজন অফিসার তাঁর উপর নৃশংস যৌন নির্য্যাতন চালায় এবং সেই যৌন নিপীড়নের দৃশ্য আরেকজন অফিসার মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিংও করে।

পরিবার ও সাহায্যকারী আইনজীবীদের হেনস্থাঃ মনজিতের মা এবং বন্ধু আমান, মনজিতের বেআইনি আটকের খবর শুনে আদালতে মনজিতের মুক্তির আবেদন (হেবিয়াস করপাস পিটিশন) জানান। আদালত থেকে ফেরার পথে আমান যখন মনজিতের মা-কে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দিল্লির কাছে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিউ ফ্রেন্ডস কলোনির দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেলে নিয়ে আসা

হয়। দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেলের অফিসাররা মনজিতের মুক্তির জন্য তাঁকে আদালতে কোনোরকম আইনি আবেদন করতে বারণ করে এবং তাদের কথা না-মানলে আমানের বিপদ হবে বলে হুমকি দেয়। তাদের এই হুমকি একজন নাগরিকের আইনি সুরাহা ও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকারের উপর একটি সরাসরি আঘাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দিল্লি পুলিশের দ্বারা আরও অপহরণ ও নির্য্যাতনঃ উপরোক্ত ঘটনাবলির ঠিক পরের দিন অধিকার আন্দোলন কর্ম্মী গৌরবকে বেআইনি ভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল। গৌরবের আরেক আটক সঙ্গী রুদ্রের সাথে একই ঘরে আটকে রেখে গৌরবের উপর শুরু হয় ভয়াবহ শারীরিক ও যৌন নির্য্যাতন। গৌরব ও রুদ্রকে নগ্ন করে শারীরিক নির্য্যাতন চলে। লোহার চেইন দিয়ে গৌরবের যৌনাঙ্গে একের পর এক আঘাত করা হয়। গৌরবের থেকে জোর করে ভুয়ো স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে নির্য্যাতনকারী অফিসারেরা। গৌরব তা' করতে অস্বীকার করলে তাঁর মাথা ঘরের দেওয়ালে জোরে জোরে ঠুকে আঘাত করা চলতে থাকে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক ছাত্র অক্ষয়কেও একই ভাবে তুলে নিয়ে তাঁর উপর নির্য্যাতন শুরু হয়। তাঁর আগে আঘাত পাওয়া হাঁটুতে দিল্লী পুলিশের অফিসাররা আঘাত শুরু করে, তারপর তাঁর দু'পা ফাঁক করিয়ে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করা হয়।

গত ১৩ মার্চ '২৬ দিল্লী পুলিশ অন্যান্যদের সাথে অপহরণ করে আটক করে অধিকার কর্ম্মী অবিনাশকে। অবিনাশের উপরও চলে লাগাতার লাথি, থাপ্পড় সহ নানারকম নির্ম্মম নির্য্যাতন, সঙ্গে নারী সাজিয়ে অপমানজনক যৌন লাঞ্ছনা। হুমকির মুখে অবিনাশ ও গৌরবকে নিজেদের মধ্যে ঘৃণ্য সমকামী যৌনতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়। সঙ্গে আটক সমস্ত বন্দির উপরও চলে নির্ম্মম অত্যাচার।

অধিকার কর্মী রুদ্রের উপর নির্যাতনঃ অধিকার কর্ম্মী রুদ্রকে দিল্লী পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসারের ঘরে নিয়ে গিয়ে নগ্ন করে নির্ম্মম প্রহার ও যৌন নির্য্যাতন করা হয়। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় যে, তাঁকে হেফাজতেই হত্যা করে তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হবে। রুদ্রকেও মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁর আত্মসন্মান ও মনের জোর ভাঙতে তাঁকে লাগাতার অত্যাচার করে চলে দিল্লী পুলিশের লোকেরা।

নির্যাতনের পরিকল্পিত ধারাঃ দিল্লী পুলিশের দ্বারা আটক সমস্ত অধিকার কর্ম্মীদের উপর ধারাবাহিকভাবে এইরকম জঘন্য কায়দায় শারীরিক ও যৌন নির্য্যাতন চলে। বন্দিরা আমাদের কাছে যে বয়ান দিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয় যে; শ্রমিকনেতা, ছাত্রকর্ম্মী, অধিকার কর্ম্মী এবং উচ্ছেদ-বিরোধী কর্ম্মীদের উপর পরিকল্পিতভাবে ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে।

বেআইনিভাবে অপহরণ করা, কারণ না দেখিয়ে আটক, হেফাজতে নিয়ে শারীরিক ও যৌন নির্য্যাতন, জাতপাত তুলে হেনস্থা, জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা এবং পরিবারের ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া, এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পদ্ধতিগুলি সরাসরি ভারতের সংবিধান, ভারতের সমস্ত মানবাধিকার রক্ষা আইন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্য্যাতন-নিরোধকারী আন্তর্জাতিক সনদ লঙ্ঘনকারী।

আটক ব্যক্তিদের সঙ্গী আমানকে আদালতে যেতে এবং তাঁদের মুক্তির আবেদন করতে বাধা দেওয়ার মত দুষ্কর্ম দিল্লী পুলিশের মত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থাকে প্রতিহত করার জঘন্য অভ্যাসে পরিণত হয়ছে।

মিলিত সংগঠনগুলির দাবি:

১) শ্রমিকনেতা, ছাত্র আন্দোলনকর্ম্মী, অধিকারকর্ম্মী ও উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনকর্ম্মীদের বেআইনিভাবে আটক করা, নির্য্যাতন ও হেনস্থা করা অবিলম্বে বন্ধ হোক।

২) দিল্লী পুলিশের দ্বারা এই জঘন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘটনাগুলির সুনির্দিষ্ট তদন্ত করতে স্বাধীন বিচাবিভাগীয় তদন্ত হোক।

৩) দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেলের নির্য্যাতনকারী ও যৌন হেনস্থাকারী অফিসারদের অবিলিম্বে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।

৪) শ্রমিকনেতা, ছাত্র আন্দোলনকর্ম্মী, অধিকারকর্ম্মী ও উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনকর্ম্মীদের থেকে বেআইনিভাবে বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল, ল্যাপটপ-সহ সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইস এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও নথিপত্র অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হোক।

রাষ্ট্রীয় হিংসা বন্ধ হোক। সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে উর্দ্ধে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছে, মিলিত সংগঠনগুলি।

ক্যাম্পেইন এগেইন্সট স্টেট রিপ্রেশান (রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী প্রচার আন্দোলন)-এর মিলিত সংগঠনগুলি—

এ আই আর এস ও, এ পি সি আর, এ এস এ, বি এ এস এফ, বি এস এম, ভীম আর্মি, বি এস সেম, সি ই এম, কালেক্টিভ, সি আর পি পি, সি এস এম, সি টি এফ, ডি আই এস এস ই, ডি এস ইউ, ডি টি এফ, ফোরাম এগেইন্সট রিপ্রেশান তেলেঙ্গানা,

ফ্র্যাটারনিটি, আই এ পি এল, ইনোসেন্স নেটওয়ার্ক, কর্ণাটক জনশক্তি, এল এ এ, মজদুর অধিকার সংগঠন, মজদুর পত্রিকা, এন এ পি এম, নাজারিয়া ম্যাগাজিন, নিশান্ত নাট্য মঞ্চ, নউরুল, এন টি অউ আই, পিপলস ওয়াচ, রিহাই মঞ্চ, সমাজবাদী জনপরিষদ, সমাজবাদী লোক মঞ্চ, বহুজন সমাজবাদী মঞ্চ, ইউনাইটেড পিস আলায়ান্স, ডাবলু এস এস, অয়াই ফোর এস।

বিজ্ঞানকর্ম্মী আমিরচাঁদের ঘটনা: নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন

প্রতাপ চন্দ্র দাস

অঙ্গদান। প্রচলিতের সীমাকে অতিক্রম করে যেন অসীমের দিকে যাওয়া এক কর্ম্ম। কোনও এক সময়ে হয়তো মনুষ্যসমাজদেহের কিছু অংশের মধ্যে মানবতাবোধ এমন এক স্তরে এলো- আমার এ-দেহের বিনাশের পর আমার-ই কোনও এক অঙ্গে চলৎ শক্তি রহিত কোনও মানুষ, আবার চলতে পারবে। তার জীবনও আবার জুড়ে যাবে চলমান এক সমাজের সঙ্গে। অঙ্গ দান করা মানুষ তার মনকে বহন করে মানবে রূপান্তরিত হল। সভ্যতার অগ্রগমন হচ্ছিলো। মনে হয়, এই ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১২ তারিখে যেন রাষ্ট্র যন্ত্রের এক অঙ্গ পুলিশ দিয়ে রুদ্ধ করতে চাইছে সভ্যতার অগ্রগমনকে।

চার দিন জেল হেফাজতে কাটানোর পর অবশেষে গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, জামিন পেয়েছিলেন বিজ্ঞান কর্ম্মী আমিরচাঁদ। মৃত মা রাবেয়া বিবি'র মরণোত্তর চক্ষুদানকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া তচোখ চুরিদ ও 'অঙ্গ চুরি'-র মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পরিবেশকর্ম্মী আমির চাঁদ শেখ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনা সমাজে প্রথমে যেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তেমনি পরবর্তীতে আইনি ও নৈতিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছে। অভিযোগকারী রসিদ শেখ আদালতে হলফনামা দিয়ে জানান, গ্রামবাসীর কথায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি অভিযোগ করেছিলেন এবং অভিযুক্তদের জামিনে তাঁর আপত্তি নেই। কৃষ্ণনগরের বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (পঞ্চম আদালত) কাকলি অধিকারী পাঁচ জনের জামিন মঞ্জুর করেন। তাঁরা জেলা সংশোধনাগার থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেন এবং সন্ধ্যায় সেখান থেকেই মুক্তি পান। এই মুক্তি নিঃশর্ত নয়, এটি জামিন সাপেক্ষ।

এই ঘটনার পটভূমিতে রয়েছে এক মানবিক সিদ্ধান্ত। ২০২৪ সালে আমির চাঁদের মা রাবেয়া বিবি মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দানের অঙ্গীকার করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, সরকারি নিয়ম মেনে তাঁর কর্ণিয়া দান করা হয়। চক্ষুদান বা অঙ্গদান কেবল একটি চিকিৎসাগত প্রক্রিয়া নয়; এটি এক গভীর মানবিক ও সামাজিক অঙ্গীকার। মৃত্যুর পরও অন্যের জীবনে আলো ফিরিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক। ভারতে অঙ্গদান আন্দোলন বহু বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে। ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক ভীতি ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছেন বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজকর্ম্মীরা। এই প্রেক্ষাপটে চক্ষুদানের মতো একটি স্বেচ্ছাসেবী ও আইনসম্মত কর্ম্মসূচীকে ঘিরে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ওঠা স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময় ও উদ্বেগের জন্ম দেয়।

অভিযোগ ওঠার পর দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয় আমির চাঁদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। এই তথ্য সামনে আসার পর গ্রেপ্তার ও তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হয়। ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে বলা হয়েছে, সাত বছরের কম সাজাযোগ্য অপরাধে সরাসরি গ্রেপ্তার না করে নোটিশ দিয়ে তদন্ত করা উচিত (সি আর পি সি ধারা ৪১-এ অনুসারে)। তাছাড়া, মহিলাদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত সময় ও পদ্ধতি নিয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। যদিও এই বিধানগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ না-করেই নদিয়া জেলার কোতোয়ালি থানার আইসি আমিরদের গ্রেপ্তার করে। অভিযোগকারী হলফ নামা দিয়ে জানান, বিভ্রান্তির ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। জামিন পাওয়া মানে আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করেছে যে অভিযুক্তদের তদন্ত চলাকালীন কারাগারে রাখা প্রয়োজন নেই। কিন্তু মামলা বহাল থাকা মানে তাঁদের নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে হবে, আইনি লড়াই চালাতে হবে, সামাজিক ও মানসিক চাপ সহ্য করতে হবে। এটি কার্যত শাস্তির এক প্রাথমিক রূপ, যদিও চূড়ান্ত রায় এখনো হয়নি।

নাস্তিক মঞ্চ সহ একাধিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী, পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন আমির চাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তুলেছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, মামলা প্রত্যাহার করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো জামিন। অর্থাৎ আইনি লড়াই শেষ হয়নি; বরং শুরু হয়েছে। জামিন আইনের একটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া। এটি অভিযুক্তের মৌলিক অধিকারের অংশ। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় জামিন মানেই অনেকের চোখে 'সন্দেহের ছাপ'। ফলে সম্মানহানি, সামাজিক অপপ্রচার এবং মানসিক আঘাত সহজে মুছে যায় না।

নাস্তিক মঞ্চ থেকে জোড়ালো দাবি তোলা হয়েছে, প্রথমত বিজ্ঞানকর্মী আমির চাঁদ এবং তাঁর পরিবারকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হল না কেন? দ্বিতীয়ত, আমির চাঁদের সম্মানহানির

জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পুলিশ প্রশাসনকেই দিতে হবে। তৃতীয়ত, কোতোয়ালি থানার আইসি অর্থাৎ শাসকের দলদাস পুলিশকে (মিথ্যা অভিযোগে আমির চাঁদের বেআইনি গ্রেফতারের জন্য) সাসপেন্ড করে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অঙ্গদান আন্দোলন এখনও সামাজিকভাবে সংবেদনশীল একটি ক্ষেত্র। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই অভিযোগ বা বিতর্ক সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করেছে। অঙ্গদান প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ, এমন একটি সম্ভবনা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। এর পর মানুষ পিছিয়ে আসতেও পারেন। এতে দীর্ঘমেয়াদে বহু রোগীর জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ হবে। স্বচ্ছতা ও সচেতনতার দিকটিকে এই ঘটনা অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উচিত অঙ্গদান সংক্রান্ত আইন, প্রক্রিয়া ও সুরক্ষা সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয়। কিন্তু পুলিশ। আমির চাঁদকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে অঙ্গদান আন্দোলনকে আরও একশো বছর পিছিয়ে দিল, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

আমির চাঁদ শেখ ও তাঁর পরিবারের জামিন নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। কিন্তু এটি চূড়ান্ত মুক্তি নয়। এই ঘটনা আমাদের সামনে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন রেখে যায়, আইনের প্রয়োগ কি যথাযথ হয়েছে? গ্রেপ্তার কি ছিল প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য? অঙ্গদান আন্দোলনের প্রতি সমাজের আস্থা কীভাবে রক্ষা করা যাবে? ন্যায়বিচার কেবল আদালতের রায়ে সীমাবদ্ধ নয়; ন্যায়বিচার হলো এমন একটি পরিবেশ, যেখানে নাগরিক মানবিক কাজ করতে ভয় পাবেন না, যেখানে অভিযোগ উঠলে তা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হবে, এবং যেখানে প্রশাসন ও নাগরিক উভয়ের মধ্যে আস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু আমির চাঁদের ঘটনায় প্রশাসনের ও আদালতের রায়ে আমরা আপামর জনসাধারণ হতাশ।

সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA)

আনন্দ ইসলাম

লাদাখের প্রখ্যাত পরিবেশবিদ ও সমাজকর্ম্মী সোনম ওয়াংচুকের ওপর জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA) প্রয়োগ এবং পরবর্তীতে দীর্ঘ ১৭০ দিন পর তাঁর মুক্তি গণতান্ত্রিক ভারতে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ভারসাম্যের প্রশ্নটিকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই গ্রেপ্তারি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা আইন সুরক্ষাকবচ না-কী দমনের হাতিয়ার ?

প্রেক্ষাপট সোনম ওয়াংচুক ও লাদাখ আন্দোলন

লাদাখের জন্য ষষ্ঠ তফশীলভুক্ত স্বায়ত্তশাসন এবং পরিবেশগত সুরক্ষার দাবিতে সোনম ওয়াংচুক দীর্ঘকাল ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। তবে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেহ'র গণ আন্দোলনের জেরে সরকার তাঁকে 'প্রধান উস্কানিদাতা' হিসেবে অভিযুক্ত করে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে তাঁর ওপর জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA) আরোপ করে রাজস্থানের যোধপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। দীর্ঘ ১৭০ দিন বন্দি থাকার পর, ২০২৬ সালের ১৪ মার্চ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর ওপর থেকে এনএসএ প্রত্যাহার করে নেয়। সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলার রায় আসার ঠিক আগেই এই মুক্তি সরকারের পদক্ষেপের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আইনের অপব্যবহারের চিত্র

জাতীয় নিরাপত্তা আইন (১৯৮০) কোনও ব্যক্তিকে বিচার বা অভিযোগ ছাড়াই ১২ মাস পর্যন্ত আটকে রাখার ক্ষমতা দেয়। ওয়াংচুকের মত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজকর্ম্মীর ওপর এই 'কালো আইন' প্রয়োগ প্রমাণ করে যে, অনেক সময় জনবিক্ষোভ বা রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করতে রাষ্ট্র একে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এই আইনের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—

* বিনা বিচারে আটক কোনও অপরাধ করার আগেই 'ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে'; এই আশঙ্কায় আটক করা যায়।
* আইনি সহায়তার অভাব আটক ব্যক্তি প্রাথমিক পর্যায়ে উকিল পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন।
* তথ্য গোপন রাষ্ট্র চাইলে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে আটকের কারণ গোপন রাখতে পারে।

উপসংহার

জাতীয় নিরাপত্তা কোনও দেশের জন্য আপসহীন বিষয় হতে পারে, কিন্তু যখন সেই আইন সোনম ওয়াংচুকের মত জনপ্রিয় আন্দোলনকারীর কণ্ঠরোধ করতে ব্যবহৃত হয়, তখন তা' গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ। আদালত বারবার বলেছে যে, এই আইন কেবল 'ব্যতিক্রমী' পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু বাস্তব চিত্র প্রায়ই উল্টো কথা বলে।

এনএসএ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও তথ্য:

১. এ পর্যন্ত কত মানুষের বিরুদ্ধে এনএসএ ব্যবহৃত হয়েছে? ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB) প্রতি বছর এই সব তথ্য দিলেও, এনএসএ-র অধীনে মোট কতজন আটক হয়েছেন তার কোনও নির্দিষ্ট সঙ্কলিত ঐতিহাসিক সংখ্যা (যেমন ১৯৪০ থেকে আজ পর্যন্ত) প্রকাশ করা হয় না। তবে বিভিন্ন সূত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী

* শুধুমাত্র ২০১৯ ও ২০২০ সালে প্রায় ১,২০০ জনেরও বেশী মানুষের ওপর এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

* সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (২০২১-২০২৪) উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরে এই আইনের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী দেখা গেছে।

২. তারা কারা?

সাধারণত জঙ্গি দমনে বা আন্তঃরাজ্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে এই আইন ব্যবহারের সরকারি প্রতিশ্রুতি থাকলেও, তালিকায় দেখা যায়

* রাজনৈতিক বিরোধী বিরোধী দলের নেতা ও স্থানীয় কর্ম্মী।

* মানবাধিকার কর্ম্মী ও সাংবাদিক সোনম ওয়াংচুক, ডাক্তার কাফিল খান বা সাংবাদিক কিশোরচন্দ্র ওয়াংখেম-এর মত ব্যক্তিরা।

* পশু পাচার বা ধর্মীয় অবমাননার অভিযুক্ত বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে গোহত্যার অভিযোগে বহু মানুষের ওপর এই আইন প্রয়োগের উদাহরণ রয়েছে।

৩. এখন এনএসএ-তে কত বন্দি আছেন?

২০২৬ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত সঠিক মোট সংখ্যাটি পরিবর্তনশীল এবং সরকারিভাবে রিয়েল-টাইম ডেটা পাওয়া কঠিন। তবে জেল পরিসংখ্যান এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বর্তমানে আনুমানিক ৪০০ থেকে ৬০০ জন ব্যক্তি এনএসএ-র অধীনে বিভিন্ন কারাগারে আটক রয়েছেন। এদের মধ্যে একটি বড় অংশই বিচারাধীন নয়, বরং 'প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন' বা প্রতিরোধমূলক আটকের আওতায় রয়েছেন।

এপিডিআর দীর্ঘ কাল ধরে কালা আইন বলে অভিহিত করে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ) বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে।

জামিনের শর্ত

রঞ্জিত শূর

২০২০ সালের দিল্লী হিংসা মামলায় দীর্ঘ পাঁচ বছরের বেশী সময় জেলবন্দি থাকার পর গত ৫ জানুয়ারি, '২৬ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গুলফিসা ফাতিমা সহ পাঁচজনকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। বাকি চারজন হলেন মীরান হায়দার, শিফায়ুর রহমান, মহম্মদ সালিম খান এবং সাদাব আহমেদ। এই মামলাতেই অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামের জামিনের আবেদন প্রত্যাখান করলেও গুলফিসাদের জামিন দিয়েছে আদালত।

কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে আদালত তাঁদের 'মুক্ত' জীবনে ১১ দফা কঠিন শর্ত আরোপ করেছে। বিষয়টি নিয়ে চর্চা হওয়া জরুরি। প্রশ্ন উঠেছে, সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের তিহার জেল থেকে বের করে কি বৃহত্তর কোন জেলে পাঠালো? প্রশ্ন উঠেছে এইসব শর্তাবলী ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ও ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। সুপ্রীম কোর্টের আদেশে যে ১১ দফা শর্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল জামিন প্রাপ্তদের প্রত্যেককে ২লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড দিতে হবে। সঙ্গে দু'জন করে একই মূল্যের স্থানীয় জামিনদার। জামিন পেলেও তাঁরা আদালতের অনুমতি ছাড়া দিল্লির বাইরে যেতে পারবেন না। দিল্লিতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। যাদের পাসপোর্ট আছে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। পাসপোর্ট না থাকলে তাও হলফনামা দিয়ে নিম্ন আদালতে জানাতে হবে। পুলিশকে আদালতের নির্দেশ, দেশের সমস্ত ইমিগ্রেশন দপ্তরে পুলিশ জানিয়ে দেবে এই ৫ জামিনপ্রাপ্তকে যেন কোনও মতেই দেশের বাইরে যেতে দেওয়া না হয়। প্রত্যেকের বাসস্থানের ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার এবং ই-মেইল আইডি স্থানীয় পুলিশ ও নিম্ন আদালতে জমা দিতে হবে।

কোনওটার কোনও বদল করতে হলে সাত দিন আগে পুলিশ ও আদালতকে জানাতে হবে। পাঁচ জনকেই সপ্তাহে দু'দিন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার, বেলা দশটা থেকে বারোটার মধ্যে স্থানীয় থানায় হাজিরা রেকর্ড করাতে হবে। প্রতিমাসে সেই হাজিরার রেকর্ড ট্রায়াল কোর্টে জমা দেবে পুলিশ। ট্রায়াল কোর্ট হাজিরায় নজর রাখবে।

জামিন প্রাপ্তরা এই মামলার কোনও বিষয়ে এবং মামলায় জড়িত কারও সম্বন্ধে কোথাও কোনও কথা বলতে পারবেন না। লিখতে পারবেন না। সমাজ মাধ্যমে কোনও পোষ্ট করতে পারবেন না। কোথাও এই মামলা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধ-

প্রবন্ধ কিচ্ছু লিখতে পারবেন না। এই মামলা সংক্রান্ত কোনও তথ্য কোনও ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন না। কোনও জমায়েত, কর্ম্মসূচীতে যোগ দিতে পারবেন না। স্বশরীরে বা ভিডিও মাধ্যম কোনটাতেই যোগ দেওয়া যাবে না। কোথাও কোনও বক্তৃতা দিতে পারবেন না। তাঁরা কোনও মাধ্যমে কোনও ইস্তাহার বা পোষ্টার-ব্যানার প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবেন না। বিচার চলাকালীন ট্রায়াল কোর্টে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে। বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় এমন কোনও আচরণ বা পদক্ষেপ করতে পারবেন না। জামিনে থাকাকালীন তারা শান্তি বজায় রাখবেন, সদাচরণ করবেন। কোনও বেচাল দেখলে পুলিশ জামিন বাতিলের আবেদন করতে পারবে। উপরোক্ত ১১ দফা শর্ত সহ জামিনের কোনও রকম অপব্যবহার হলে বা ১১ দফার কোন একটিও ভঙ্গ করলে জামিন বাতিলের জন্য পুলিশ ট্রায়াল কোর্টে আবেদন জানাতে পারবে।

জামিনের শর্তগুলো দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে শর্তগুলো ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) নম্বর এবং ২১ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করেছে। ১৯ (১) নং ধারা অর্থাৎ মত প্রকাশের অধিকার, সংগঠন করা, সংগঠিত হওয়া, স্বাধীন ভাবে বসবাস, চলাফেরা ইত্যাদি। ২১ নং ধারা মানে জীবনের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্য্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার। জামিন পাওয়ার পরেও কোনভাবে মত প্রকাশ করতে না-পারা, স্বাধীনভাবে বসবাস চলাফেরা করতে না-পারা, সমাবেশে যোগ দিতে না-পারার অর্থ একজন মুক্ত মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে সর্বতোভাবে কেড়ে নেওয়া। অতীতে সুপ্রিম কোর্ট এবং আইন ও বিচার বিশেষজ্ঞরা বারে বারে বলেছেন জামিনের শর্ত এমন হওয়া উচিত নয় যা জামিন পাওয়ার পরেও জেলখানার পরিবেশ তৈরি করে। সুপ্রিম কোর্ট জামিনের পরে বাক স্বাধীনতা কাড়ার বিরুদ্ধে আগেও মত প্রকাশ করেছে।

গুলফিসাদের জামিনের আদেশে বিচারপতিরা বলেছেন যেহেতু এটা সন্ত্রাস দমন আইনে বা ইউএপিএ-তে রুজু হওয়া মামলা তাই জাতীয় নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে আদালত এসব কঠোর শর্ত চাপিয়েছে। তারা বলেছেন, জামিন মানেই অপরাধ থেকে মুক্তি নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কিছুদিন আগেই বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্র যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, জামিন পাওয়ার আগে এই ৫ জন ইতিমধ্যে বিনা বিচারে ৫ বছর জেল খেটেছে। বিনা বিচারে এই দীর্ঘ বন্দি জীবন এবং অদূর ভবিষ্যতে বিচার শেষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না-থাকায় এই পাঁচজন জামিন পেয়েছেন।

ভারতের বিচার ব্যবস্থার দর্শন ছিল জামিন অধিকার– জেল ব্যতিক্রম। সেই সব কবেই চুকেবুকে গেছে। ইউএপিএ আইনে জামিন পাওয়াটাই দুষ্কর। বিচার প্রক্রিয়াটাই সাজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের পর বছর চলে সেই বিচারের প্রহসন। তারপরও পাঁচ বছর বাদে কোনও বন্দি যখন জামিন পাচ্ছে তার উপর এমন ১১ দফা শর্ত চাপিয়ে রাখা তার স্বাভাবিক জীবন অসম্ভব করে তোলে। এটা আসলে পরোক্ষভাবে তাদের শাস্তি দেওয়ারই নামান্তর। তাই উমর খালিদ, শার্জিল ইমামের জামিন না হওয়ার প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে জামিনের উপর এরকম ১১ দফা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ারও প্রতিবাদ হওয়া দরকার। বলা দরকার জামিন দিয়েও অস্বাভাবিক শর্ত চাপিয়ে কারও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন। দাবি উঠুক, গুলফিসাদের জামিনের শর্তাবলী ফের একবার বিচার করে দেখুক সুপ্রীমকোর্ট। ন্যায় বিচারের স্বার্থে এটা জরুরি।

রূপান্তরকামী আইনের সংশোধন অধিকারের মূলে আঘাত

ভারতবর্ষে 'রূপান্তরকামী ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৯-এর সাম্প্রতিক সংশোধনী নিয়ে বর্তমানে দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্ক ও প্রতিবাদ চলছে। গত মার্চ ২০২৬-এ লোকসভা ও রাজ্যসভায় এই সংশোধনী বিলটি পাস হয়ে আইনের অংশ হয়ে গেছে। রূপান্তরকামী সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার কর্ম্মীরা একে 'পিছু হটা' পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করছেন।

সংশোধনীর মূল বিষয়গুলি এবং বিরোধিতার কারণ নিচে আলোচনা করা হলো

সাম্প্রতিক প্রধান সংশোধনীসমূহ (২০২৬)—

স্ব-পরিচয়ের অধিকার খর্ব

* পূর্বের আইনে একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের লিঙ্গ পরিচয় (Self-determination) নির্ধারণ করতে পারতেন। নতুন সংশোধনীতে এই ধারাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন একজন ব্যক্তি নিজে নিজের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে পারবে না।

* মেডিক্যাল বোর্ডের আবশ্যকতা এখন থেকে পরিচয়পত্রের (Certificate of Identity) জন্য জেলা শাসকের কাছে আবেদন করার পর, একটি বিশেষ 'মেডিক্যাল বোর্ড' সেই ব্যক্তির শারীরিক ও জৈবিক পরীক্ষা করবে। বোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

* সংজ্ঞার পরিবর্তন

'ট্রান্স ম্যান'(Trans-man), 'ট্রান্স-উইম্যান' (Trans-woman) এবং 'জেন্ডার-কুইয়ার' (Gender queer)-এর মত অন্তর্ভুক্তিমূলক শব্দগুলি মূল সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় (যেমন হিজড়া, কিন্নর ইত্যাদি) এবং জৈবিক ভিন্নতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

* কঠোর দণ্ডবিধি জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি বা পাচারের ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ অনেকটা বাড়ানো হয়েছে।

কেন রূপান্তরকামী ও মানবাধিকার কর্মীরা এর তীব্র বিরোধিতা করছেন?

মানবাধিকার কর্ম্মীদের মতে, এই সংশোধনীগুলি সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক 'নালসা' (NALSA v. Union of India, ২০১৪) রায়ের পরিপন্থী। বিরোধিতার মূল কারণগুলি হল—

* মর্য্যাদাহানি ও গোপনীয়তা লঙ্ঘন পরিচয় প্রমাণের জন্য কোনও মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে শারীরিক পরীক্ষা দেওয়াকে আন্দোলনকারীরা অপমানজনক এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করছেন। এটি ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার (Right to Privacy) ক্ষুণ্ণ করে।

* নালসা রায়ের অবমাননা ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, কোনও অস্ত্রোপচার বা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ছাড়াই একজন ব্যক্তি তার লিঙ্গ পরিচয় নিজে নির্ধারণ করতে পারবেন। নতুন আইন এই আইনি স্বীকৃতিকে অস্বীকার করছে।

* বর্জন ও বৈষম্য 'ট্রান্স-ম্যান' বা 'নন-বাইনারি' ব্যক্তিদের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ায় একটি বিশাল অংশ আইনি সুরক্ষা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

* আমলাতান্ত্রিক জটিলতা জেলা শাসক এবং মেডিক্যাল বোর্ডের ওপর নির্ভরতা বাড়ার ফলে সাধারণ রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জন্য পরিচয়পত্র পাওয়া আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, যা দুর্নীতি ও হয়রানির সুযোগ তৈরি করতে পারে।

* মতবিনিময়ের অভাব আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে কোনো আলোচনা না করেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সংসদে এই বিলটি পাস করা হয়েছে।

অনেক মানবাধিকার সংগঠন এই সংশোধনীকে "Black Day" বা 'কালো দিন' হিসেবে অভিহিত করে একে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের দাবি, সুরক্ষা দেওয়ার নামে এই আইন আসলে রূপান্তরকামীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

নতুন সংশোধনীতে আরও মারাত্মকভাবে বলা হয়েছে, নিজের লিঙ্গ নিজেই নির্ধারণের বিষয়টা কোনদিন আইনে ছিল না বলেই ধরে নিতে হবে। এর ফলে ২০১৯ এর আইন অনুযায়ী যে ৩২ হাজার রূপান্তরকামী সার্টিফিকেট ইসু হয়েছিল সব বাতিল গণ্য হবে।

'জনগণের আইনজীবী' সুরেন্দ্র গাডলিং-এর মুক্তির দাবি

''ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট স্টেট রিপ্রেশন- CASR'', নয়া দিল্লি, ১২ মার্চ, ২০২৬

Campaign Against State Repression (CASR) ১২ মার্চ Press Club of India-এ একটি জনসভা আয়োজন করে, যেখানে 'জনগণের আইনজীবী' হিসেবে পরিচিত সুরেন্দ্র গাডলিং -এর অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়। তিনি বর্তমানে ভীমা কোরে গাও মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দি আছেন। সভায় আইনজীবী, সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদ'রা বক্তব্য রাখেন এবং এই মামলার ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং আইন পেশার স্বাধীনতার ওপর যে প্রভাব পড়ছে তা' তুলে ধরেণ।

আইনজীবী জগদীশ মেশরাম যিনি গ্যাডলিং-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে গাডলিং-এর দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যেসব মানুষের আইনি প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার সুযোগ প্রায়ই থাকে না, তাদের মামলা গ্রহণে গাডলিং সবসময় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর মতে, গাডলিং-এর কারাবন্দিত্ব সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষের পক্ষে কাজ করা আইনজীবীদের ওপর একটি গুরুতর আক্রমণের প্রতীক। তিনি আরও বলেন, গাডলিং নিয়মিতভাবে পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছ থেকে নানা ধরণের হুমকি পেতেন।

আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ কঠোর আইন ব্যবহার করে কর্ম্মী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে মামলার অপব্যবহারের বৃহত্তর প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, এ ধরনের মামলা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষয় করে। কঠোর আইনি ধারায় দীর্ঘদিন মানুষকে কারাবন্দি রাখার বিষয়টি আইনের শাসন নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আইন গবেষক গৌতম ভাটিয়া, হানি বাবু এবং সুরেন্দ্র গাডলিং-এর লেখা একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেন, যেখানে আন

ল ফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশান) [UAPA]-এর অধীনে Watali judgment–এর ব্যাখ্যা নিয়ে আইনি প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, গাডলিং ও হানী বাবুর মতে, এই আইনে তআদালতদ শব্দটি এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে জামিনের আবেদন বিবেচনার সময় পুলিশের প্রাথমিক অভিযোগ মূল্যায়নের ক্ষমতা কার্য্যত কেবল সেশন আদালতের হাতেই থাকে। এর ফলে উচ্চ আদালত, যেমন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের পর্য্যালোচনার ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, UAPA–এর ধারা ৪৩ডি(৫)-এ ত্যুক্তিসঙ্গতদ শব্দটির উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে আদালত শুধু অভিযোগকে সরাসরি গ্রহণ না করে তার যুক্তিসঙ্গততা পরীক্ষা করবে।

তদন্তধর্মী সাংবাদিক সৌরভ দাস বলেন, বিচারব্যবস্থার কার্য্যপ্রণালী, বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ক্রমশ এমন এক 'ম্যানেজারিয়াল আদালত'-এর মত হয়ে উঠছে, যা রাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, আইনি ব্যবস্থার ভেতরে 'ফিক্সার'-দের উপস্থিতি বেড়ে গেছে, যা বিচারব্যবস্থার সততা ও স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করছে।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে বলেন, বিচারব্যবস্থাকে ব্যবস্থার তঅ্যাক্সেলারেটরদ নয়, বরং তার তব্রেকদ হিসেবে কাজ করতে হবে। আদালতের কাজ হল, রাষ্ট্রক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা। তিনি শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে বিচারকরা একসময় আইনজীবীই ছিলেন এবং বলেন, ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন বিচারব্যবস্থার সদস্যরা যেন মর্যাদা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে জনগণের সামনে দাঁড়াতে পারেন।

অধ্যাপক নন্দিতা নরাইন যিনি দিল্লী ইউনিভারসিটি টিচার'স এ্যাসোসিয়েশান (ডিউটা)-এর প্রাক্তন সভাপতি, সাংবিধানিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষায় জনসংহতির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে কঠোর আইনের আওতায় আইনজীবী, কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের অব্যাহত কারাবন্দিত্বের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত বক্তারা সম্মিলিতভাবে সুরেন্দ্র গাডলিং-এর অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান এবং নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে রাষ্ট্রীয় দমন নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানান।

তথ্যানুসন্ধান: এ পি ডি আর, চন্দননগর শাখা

১৪ জুলাই ২০২৫ চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের ঘটনা:

১৪ জুলাই, ২০২৫, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে (ইংরেজি বিভাগে) একটি ঘটনা ঘটে যা সারা শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ইংরেজি বিভাগ) চন্দননগর পৌরনিগম পরিচালিত বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ব্যবস্থাটির একজনই দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

এই ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের দুই অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দু'টি ছাত্রের যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেন। এক পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে চন্দননগর থানায় একটি এফ আই আর (১৩০/২০২৫) দাখিল করা হয় এবং পুলিশ Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) আইনের ৪/৬ ধারায় প্রধান শিক্ষককে অভিযুক্ত করে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে প্রথমে নিজেদের হেফাজতে নেয় পরে আদালতের নির্দেশে তাঁর জেল হেফাজত হয়।

এই ঘটনায়, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি চক্রান্তের শিকার' এই অভিযোগ তুলে শহরে একাধিক মিছিল হয়, মূলত অনির্দিষ্ট শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবক গোষ্ঠীর উদ্যোগে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চন্দননননগর মহকুমা আদালতে বিচার চলছে। অভিযোগকারী পরিবারের হয়ে মামলা লড়ছেন সরকারি আইনজীবী।

APDR চন্দননগর, এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনাটি নিয়ে অভিযোগকারী পরিবার দু'টির সঙ্গে কথা বলে। পরিবারের সদস্যদের নাম সঙ্গত কারণে উল্লেখ করা হয়নি। কথাবার্তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল

১) প্রথম অভিভাবকের সঙ্গে কথাবার্তা

i. প্রথম অভিযোগকারী ছাত্রটির বাড়ি চন্দননগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ২৪ জুলাই ২০২৫, আমরা এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করি । ছোটো একটি দোতলা বাড়িতে পরিবারটি থাকে। তাদের এক মুদিখানা আছে। মূলত ছাত্রটির মা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তার দাদু (পিতামহ) এবং কাকা

মাঝেমধ্যে কথাবার্তায় যোগদান করেন।

ii. মায়ের বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তার পুত্রকে স্কুল থেকে আনার পথে সে অভিযোগ করে যে তাকে এবং আর-একটি ছাত্রকে ক্লাসে মারামারি করার জন্য ক্লাস টিচার প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক শাস্তিস্বরূপ তাদের একটি ঘরে বন্ধ করে রাখেন এবং কিছুক্ষণ পরে তিনি তাদের আবার ক্লাসে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ওই ঘরে বন্ধ করে রাখার সময় তাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের যে ধরণের আচরণের বিবরণ সে দেয় তা আইনের চোখে শিশু যৌন-নির্য্যাতনের অপরাধ। ওই আচরণের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রটি সেই সময় বমি করে ফেলে। প্রধান শিক্ষক তাদের বলেন যে ওই ঘটনার কথা তারা যদি তার কাউকে বলে, তাহলে তাদের চরম শাস্তি হবে।

iii. এরপর বাড়ি ফিরে প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে ছাত্রটির পরিবার ছাত্রটিকে নিয়ে চন্দননগর থানায় আসে। পরিবারের বয়ান অনুযায়ী, এরপর থানা থেকে যোগাযোগের ভিত্তিতে পরিবারটির বাসস্থানের এলাকার সংশ্লিষ্ট পৌর প্রতিনিধি এবং শাসকদলের আর-একজন মহিলা রাজনৈতিক নেত্রী থানায় উপস্থিত হন।

iv. পুলিশের পরামর্শে এরপর পরিবার, স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি, ওই মহিলা নেত্রী এবং পুলিশের প্রতিনিধিরা অদূরবর্তী চন্দননগর পৌরনিগমে পৌরপ্রধানের কাছে উপস্থিত হয়।

v. পৌরপ্রধান বলেন তিনি ঘটনাটি শুনেছেন। তিনি, পুলিশ, স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি, অন্য এক পৌর প্রতিনিধি (যিনি সে সময় পৌরপ্রধানের ঘরে উপস্থিত ছিলেন) এবং ওই নেত্রী - নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন বলে পরিবারকে তাঁর ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ছাত্রটি এবং তার মাকে ঘরে ডেকে পুরো ঘটনাটি শোনেন।

vi. এরপর পুলিশ এবং পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে প্রধান শিক্ষকের কাছে উপস্থিত হয়। পরিবারের বয়ান অনুযায়ী, ইতিমধ্যে কিছু যুবক ও ছাত্র থানার এবং কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের আশেপাশে ভিড় করে তাদের যাতায়াতে বাধার দেওয়ার চেষ্টা করে।

vii. এই সময় ঘটনার ভয়াবহতায় বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করেন যে জন্য অনুতপ্ত বলে তাঁরা আমাদের কাছে জানান।

viii. স্কুলে প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে পুলিশ ক্লাস টিচারের সঙ্গে কথা বলে। ক্লাস টিচার একা ছাত্রটির বয়ান নেন এবং তাঁর মোবাইল ফোনে রেকর্ডও করেন।

ix. যেহেতু অপর ছাত্রটির পরিবারের কাছ থেকে এমন কোনও অভিযোগ আসেনি এরপর তাই পুলিশের পরামর্শে তার অভিভাবককে ফোন করা হয়। দ্বিতীয় ছাত্রটির অভিভাবক প্রথমে বলেন যে তার সন্তান নির্য্যাতনের কোনও অভিযোগ বাড়িতে করেনি। কিন্তু তারপর যখন ক্লাস টিচার ফোনটি নিয়ে ছাত্রটিকে নিজে প্রশ্ন করতে শুরু করেন তখন সে জানতে চায় যে, যদি সে সব-কথা জানায় তাহলে তার কোনও শাস্তি হবে কি-না? তেমন কিছু না-হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে, প্রধানশিক্ষক শাস্তির সময় তার সঙ্গেও যে আচরণ করেছেন তার একই রকম বিবরণ সে দেয়। ক্লাস টিচার ফোনে তা রেকর্ড করেন । এরপর থানায় গেলে পুলিশ প্রথম অভিভাবকের অভিযোগ গ্রহণ করে এবং প্রধান শিক্ষককে থানায় আটক করা হয়।

x. পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম দিন ছাত্রটিকে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে ছাত্রটির যৌন নিগ্রহের জন্য কোনোরকম মেডিকেল পরীক্ষা করার অনুমতি অভিভাবকরা দেননি। পরিবারের বক্তব্য, তাঁদের ধারণা ছিল যে যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা কেবলমাত্র মেয়েদের-ই করা হয়, নাবালক শিশুর জন্য তার প্রয়োজন আছে বলে তাদের ধারণা ছিল না। সেই কারণেই তারা মেডিকেল পরীক্ষায় সম্মতি দেননি। হাসপাতালে চিকিৎসক কেবলমাত্র শিশুটির কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে রিপোর্ট লিখে দেন, কোনোরকম শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াই।

xi. প্রথম ছাত্রটির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে। কোর্টের নির্দেশে ছাত্রটির বয়ান গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রটি এবং তার অভিভাবককে জেলা শিশু কল্যাণ দপ্তরের ডাকা হয়। জেলা শিশু কল্যাণ দপ্তর তাদের কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে ছাত্রটিকে তাদের মনোবিদের পরামর্শ নিতে বলেন। পরিবার তাতে উৎসাহ দেখায়নি।

xii. পরিবারের বক্তব্য যে প্রথম দিনের পর স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি তাদের তেমনভাবে খোঁজখবর নেননি। 'কোনও রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থন করছেন কিনা' আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন যে তাদের এক আত্মীয় কোনও একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে আছেন পারিবারিক যোগাযোগে, আত্মীয়তার কারণে; কোনও রাজনৈতিক দল তাদের সাহায্য করছে না, তারাও এই সংকটে রাজনীতি যোগ করতে চান না।

xiii. তারা তাদের সন্তানকে অন্য শহরের বেসরকারি স্কুলে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করেছেন, কারণ তাদের ধারণা শহরের সরকারি, বিশেষত পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই তাদের বিরোধী। তাই সেখানে পড়াশোনা করলে

ভবিষ্যতে ছাত্রটির সমস্যা হতে পারে।

xiv. ছাত্রটি মা একথাও বলেন যে প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে তাদের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ছাত্রটির অভিযোগের পর এবং বয়ানে আরও কিছু নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উল্লেখ থাকায়, প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টেছে।

২. দ্বিতীয় অভিভাবকের সঙ্গে কথাবার্তা

I পরিবারটি চন্দননগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চন্দনগর পৌর নিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা যেটি ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত। ২৯ জুলাই ২০২৫, আমরা এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করি। কথা বলার জন্য ছাত্রটির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হয়, যিনি পেশায় রংমিস্ত্রি। অতি নিম্নবিত্ত পরিবার এবং খুবই সামান্য একটি বাসস্থান। ছাত্রটির মা এবং বাবা দু'জনেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকজন প্রতিবেশীও যোগ দেন।

ii. প্রথম দিকে প্রধান শিক্ষক শাস্তির নামে যৌন নিগ্রহ করেছেন এমন কোনও অভিযোগ তাদের সন্তান তাদের কাছে করেনি। ঘটনার দিন স্কুল থেকে ফিরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে যখন স্কুল থেকে ফোন আসে তখন তার মা বাড়িতে ছিলেন এবং স্কুলে ক্লাস টিচারের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে ঘুম থেকে তুলে তিনি ফোনে কথা বলান। তখনই ছাত্রটির মা ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারেন।

iii. তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথম অভিযোগকারী ছাত্রটি তার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের আচরণের যে বিবরণ দিয়েছে তাদের সন্তানের ক্ষেত্রেও তা একই রকম।

iv. কিন্তু পুলিশের এফআইআরে তাদের নাম নেই। যদিও তাদের পুত্রের বয়ান আদালতে গ্রহণ করা হয়।

v. আদালতে প্রথম দিন উপস্থিত থাকার সময় কয়েকজন ব্যক্তি তাদের ভয় দেখায় বা হুমকি দেয়, যা পুলিশের কাছে জানানোর পর বন্ধ হয়।

vi. ইতিমধ্যে গত ২৫ জুলাই ২০২৫ সন্ধ্যেবেলা তাদের বাড়িতে ১৫ জন যুবক এবং তার সঙ্গে কিছু মহিলা যারা স্কুলের ছাত্রদের অভিভাবক বলে তাদের মনে হয়, এবং বলেন যে তাদের মত দুর্বল আর্থিক সঙ্গতির পরিবারের পক্ষে এই মামলা চালানো সম্ভব নয়। প্রধান শিক্ষক, দরকার হলে ভাল আইনজীবীর মাধ্যমে উচ্চতর আদালতে গিয়ে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

vii. সেই যুবকরা তাদের বলে যে নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের উচিত এই অভিযোগ প্রত্যাহার করা এবং মামলা থেকে সরে আসা। তারা পরিবারের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আনে। একরকম হুমকি দিয়ে তারা বিদায় নেয়।

viii. এই ঘটনার পর পরিবার পুলিশকে এবং স্থানীয় পৌর প্রতিনিধিকে ঘটনাটি জানায় এবং ঘটনার দিন ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ স্থানীয় এলাকায় এসে খোঁজখবর নেয় কিন্তু কোনও লিখিত অভিযোগ তারা পুলিশের কাছে করেননি।

ix. পরে আমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে তারা ভদ্রেশ্বর থানায় এই হুমকির জন্য লিখিত অভিযোগ করেন যা পুলিশ গ্রহণ করেছে।

x. এই পরিবারটির যা আর্থিক সঙ্গতি তাতে তাদের পক্ষে সন্তানকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয় অথচ তারা এই স্কুলেও ছেলেকে করতে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ, তাদের উপলব্ধি যে শিক্ষকরা তাদের বিরোধী এবং ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

xi. শাসক দলের স্থানীয় এক কর্মী কথাবার্তার মাঝখানে আলোচনায় যোগ দেন। পরিবারটিও স্থানীয় পৌর প্রতিনিধিকে পুরো ঘটানাটি নিয়ে অবহিত করেছেন।

৩) দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী, আমরা 'নির্য্যাতিত' ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলিনি।

পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা যেন উপস্থিত না-থাকে তা আমরা নিশ্চিত করে ছিলাম।

ইতিমধ্যে প্রথম ছাত্রটির বাবা আমাদের জানান যে, অন্য দুই প্রাক্তন ছাত্র তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বলেছেন যে, তারাও অতীতে প্রধান শিক্ষকের যৌন নির্য্যাতনের ভুক্তভোগী। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রধান শিক্ষক একজন 'স্বভাব-অপরাধী' এবং অতীতে তার এমন আচরণের নিদর্শন রয়েছে। প্রথম অভিযোগকারী ছাত্রটির বাবার মাধ্যমে (যিনি আমাদের এই খবরটি দেন) আমরা যখন সেই দুই ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে চাই তখন তারা রাজি হয়। প্রথমে একটি দিন নির্দিষ্ট করা হয়, কিন্তু কোনও প্রাক্তন ছাত্রই আসেনি। এরপর দ্বিতীয়বার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু তাতেও তাদের সাড়া মেলেনি।

৪) এছাড়াও যে ক্লাস টিচারের ক্লাসে ঘটনাটি ঘটে এবং যিনি দুটি ছাত্রেরই বক্তব্য রেকর্ড করেছিলেন আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি নিজের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে অসম্মত হন। যদিও তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে তিনি যা জানেন তা তিনি আমাদের জানাতে রাজি আছেন। কিন্তু কোথায়

আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন এই নিয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি বলেন তাঁর পছন্দের স্থান তিনিই আমাদের পরে জানাবেন, কিন্তু এই লেখা তৈরি করা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

৫) প্রধান শিক্ষকের পরিবার বা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি।

দুদিনের কথাবার্তায় APDR-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অমল রায় (চুঁচুড়া শাখা), গৌতম মুন্সী, বাপি দাশগুপ্ত এবং শুভময় ঘোষাল।

তথ্যানুসন্ধানঃ কলকাতা নাজিরাবাদ অগ্নিকান্ড, এ পি ডি আর

বিভিন্ন সংবাদপত্র, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সমাজমাধ্যমের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গবাসী সহ গোটা ভারতে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। গত ২৫শে জানুয়ারী ২০২৬ গভীর রাতে (২'টো থেকে ৩'টের মধ্যে) অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারীর খুব ভোরে পূর্ব কলকাতার জলাভুমি সংলগ্ন আনন্দপুর অঞ্চলের করিমপুর মৌজার খেয়াদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাজিরাবাদ গ্রামে (বারুইপুর জেলা পুলিশের অধীন ও নরেন্দ্রপুর থানার আওতাধীন) এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৭ জন ব্যক্তি নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন (মতান্তরে স্থানীয় জনগনের অনুমান প্রায় ৩৯ জন নিখোঁজ) অতএব মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ অকুস্থল পরিদর্শন করে' অগ্নিকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধান করে। আমাদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ, কোয়েলী গাঙ্গুলী, রঞ্জিত সাহা, পলাশ পাল, দেবাশীষ ভট্টাচার্য এবং তুফান চক্রবর্তী।

ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া গুদাম দু'টোর সামনে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা অতি তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলের ১০০ মিটার দূরে ব্যরিকেড তৈরি করে আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অস্থায়ী ব্যারিকেডের টিনের নোটিশ বোর্ডে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নং ধারায় (সাবেক ঙ্খট্রঞ্জঙ্খ ১৪৪ ধারা) আদেশের কপি ঝোলানো । (Order Sheet Rule 129 on Records Mannual 1917) Ref MP Case No 331/2026 State vs Unknown & othrs

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বারুইপুরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সন্দীপ পাঠক ঐ দুই গুদামের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রমাণ বিকৃতি এড়ানো, প্রশাসনের অনুসন্ধানের কাজ নির্বিঘ্নে করা এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সেখানে ২৮/০১/২৬ বিকেল ৫ টা থেকে ৩০/০৩/২০২৬ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ২০২৩ BNSS ১৬৩(২) ধারা (সাবেক CRPC এর ১৪৪ ধারা) জারি করেছে। আমাদের প্রতিনিধিদল যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশ আমাদের আটকে দেয়।

উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ—

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রপুর থানার দুইজন এএসআই দেবাশীষ মিশ্র ও প্রণব মণ্ডল। প্রণব মণ্ডল আমাদের জানান ২৫জানুয়ারি, গভীর রাতে (২ টোর মধ্যে) প্রথমে নিউ পুস্পাঞ্জলি নার্সারি প্রাইভেট লিমিটেড (পুস্পাঞ্জলি ডেকরেটার্সের) গুদামে আগুন লাগে এবং সেই আগুন সংশ্লিষ্ট 'ওয়াও মোমো' সংস্থার গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে এবং ২টো গোডাউনেই দাহ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভিতরে সেই সময় অনেক শ্রমিক রাত্রের খাওয়া দাওয়া করে শুতে গিয়েছিলেন। তারা আগুন এবং কালো ধোঁয়ায় ঝলসে দমবন্ধ হয়ে মারা যান।

প্রণব মণ্ডলের দেওয়া বয়ান অনুসারে রাত আড়াইটে নাগাদ ডেকরেটার্সের গোডাউনের পশ্চিম দিকে আগুন লাগে এবং সেই সময় উত্তর দিক থেকে হাওয়া বইছিল বলে আগুন 'ওয়াও মোমো'র গোডাউনেও ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের কারণে ২ টি গোডাউনই কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় এবং গোডাউনের ভিতরে শ্রমিকরা ছুটোছুটি করছিলেন কিন্তু বেরনোর পথ খুঁজে না-পাওয়ায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। যারা বেঁচে ফিরেছেন (পুলিশের বয়ান অনুযায়ী ৩-৪ জন, যদিও তাদের পরিচয় আমাদের জানায়নি) তারা পুলিশকে বলেছেন ভিতরে ২৪-২৫ জন শ্রমিক খাওয়া দাওয়া করে রাত ১ টা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়েন। সম্ভবত তারাই আর বেরোতে পারেননি। ২ টি গোডাউনেরই বেরনোর কোনও জরুরি পথ ছিল না। দমকলের বিরাট বাহিনী এসে ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী নিউ পুস্পাঞ্জলি ডেকরেটার্সের কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল

না। ওয়াও মোমো সংস্থায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ছিল কিন্তু সেই সময়ে তা কাজ করেনি। তদন্তে প্রকাশ অগ্নি সুরক্ষার শংসাপত্র ২০২৪ সালের পর আর নবীকরণ হয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুড়ে যাওয়া দু'টো গোডাউনেরই মালিক নিউ পুষ্পাঞ্জলি নার্সারি প্রাইভেট লিমিটেড। মালিক গঙ্গাধর দাসের নামে ওই চত্বরে প্রায় ৩৫ হাজার বর্গফুটের জায়গার প্রায় পুরোটাই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বুজিয়ে করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ হাজার বর্গফুটের একটি গুদাম ওয়াও মোমোকে তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন। সেই গোডাউনেই মোমো সংস্থার কর্মীরা কাজ করতেন।

পুলিশের বক্তব্য অনুসারে মোমো সংস্থার ওয়্যার হাউসের প্রবেশ পথে নরম পানীয় বোতল ও পণ্য সামগ্রী পরের দিন শহরের বিভিন্ন আউটলেটে সরবরাহের জন্য স্তুপীকৃত অবস্থায় ছিল। ফলে বেরনোর জায়গা প্রায় ছিল না বললেই চলে। গঙ্গাধর দাসের ডেকরেটার্সের গোডাউনের ঢোকা বেরনোর দরজাটি তালাবন্ধ ছিল। ফলে আগুন লাগার পরে তা বাস্তবিকই জতুগৃহে পরিণত হয়।

এপিডিআরকে হতাহত বা নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিচয় পুলিশ দিতে পারেনি। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় দুই গোডাউনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২ টি মামলা হয়েছে এবং এই পুরো ঘটনাটা তদন্ত করছেন নরেন্দ্রপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর শ্রী বিশ্বজিৎ পাল। পুলিশের সূত্র এবং সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে যে নিউ পুষ্পাঞ্জলি নার্সারি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিক এবং দু'টি গো ডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাস এবং ওয়াও মোমো সংস্থার ম্যানেজার মনোরঞ্জন শীট এবং ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তী এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। নরেন্দ্রপুর থানা এবং দমকলের পক্ষ থেকে সরকারী বিধি অমান্য করা গাফিলতির জেরে মৃত্যুর জন্য স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। উপস্থিত ASI দেবাশীষ মিশ্র আমাদের জানান, ঘটনার পরপরই দমকলের সাতটি ইঞ্জিন এসে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ এবং স্থানীয় মানুষ উদ্ধার কাজে হাত লাগালেও আগুনের বীভৎসতায় কাউকে ভিতর থেকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শী সুজিত পাল পুলিশের বয়ানকে সমর্থন করেন।

সংবাদমাধ্যম, প্রশাসন, ডেকরেটার্স এবং ওয়াও মোমো কর্তৃপক্ষের বয়ান অনুসারে ২টি গোডাউন মিলিয়ে ২৭ জন কর্মী ছিলেন। নরেন্দ্রপুর থানায় ২৭ জনেরই নিকট আত্মীয়ের পক্ষ থেকে নিখোঁজ মামলা দায়ের করা হয়। ২৭ জন কর্মীর দেহাংশই উদ্ধার হয়েছে। চূড়ান্ত দগ্ধ হবার ফলে মৃত ব্যক্তিদের দেহের পরিবর্তে তাদের দেহাবশেষ (খুলি, হাড়, দাঁত ইত্যাদি) মিলেছে। ফরেনসিক টিম সেই নমুনার সঙ্গে তাদের নিকট আত্মীয়ের রক্তের নমুনা মিলিয়ে DNA র সাহায্যে মৃতদের সনাক্ত করবে এবং এরপরই দেহাবশেষ আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

১) ওয়াও মোমো কর্তৃপক্ষের গাফিলতিঃ - ওয়াও মোমো রাজ্যের অন্যতম QSR (Quick Service Restaurant) চেন। দেশজুড়ে তাদের অসংখ্য আউটলেট একাধিক নামে (WOW Momo, WOW Chicken, WOW Chiana, WOW Kulfi) ছড়িয়ে পড়েছে। সংস্থার তিনজনে মালিক হলেন সাগর দারিয়ানি (CEO), বিনোদ হোমাগাই এবং শাহ মিয়তাতির রহমান। এইরকম একটি বৃহৎ বিপণী তাদের ঢথন্ত্র ভ্রন্ডস্ত্র , এ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা এরকম চূড়ান্ত গাফিলতি ! এবং সমস্ত রকম নিরাপত্তাকে অগ্রাহ্য করে ও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি যা 'রামসের সাইট' হিসেবে চিহ্নিত, সেই ভরাট করা অংশে নির্মিত গোডাউনকে তাদের ব্যবসার কাজে ব্যবহার করেছে ! ঙঞ্জঙ্গট্ট এর তথ্যানুসন্ধানী দল এই কাজ সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ বলে মনে করে।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুসারে পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটার্সের মালিকের কাছে কোনো ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট বা অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র কিছুই ছিল না। ছিল না। ওয়াও মোমো সংস্থার গোডাউনে থাকলেও, তা একেবারেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। ২০২৪ সালে মার্চ মাসের পরে অগ্নি সুরক্ষা শংসাপত্র পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, শ্রম আইনের অধীনে কোনও ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ওই গুদামে ছিল না। একমাত্র প্রবেশপথ প্রায় বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাদের সংস্থার ২ জন এবং তাদের গুদামের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা NIS সংস্থার একজন কর্মীর জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনার দায় কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারে না। এই ভয়াবহ ও মর্ম্মান্তিক অগ্নিকান্ডে প্রশাসনের সর্বস্তরে যে গাফিলতি ও ব্যর্থতা ছিল, তদন্তে সেই তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

জলাভূমি রক্ষা করার এত আইনি সংস্থান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অন্তর্গত খেয়াদহ, নাজিরাবাদ, বেওতা, বামনঘাটা, তারাদহ প্রভৃতি অঞ্চলে হোগলার জঙ্গল সাফ করে, জলাভূমি বুজিয়ে ইটের দেওয়াল এবং টিনের চাল দিয়ে, বড় বড় গোডাউন তৈরী হয়েছে। তারই পরিণতি আনন্দপুর সংলগ্ন নাজিরাবাদের এই ভয়ংকর অগ্নিকান্ড।

২) ওয়্যারহাউস বা গুদাম নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় আইনি শর্তগুলি হল—

ক) গুদাম তৈরীর জন্য বাস্তু জমির বৈধ নক্সা, যা পঞ্চায়েত বা

পৌরসভার দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

খ) অগ্নি সুরক্ষা বিধি এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের পর্যাপ্ত সংরক্ষণ।

গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত সার্টিফিকেট।

ঘ) সরকারী ও বেসরকারী বীমা কোম্পানি থেকে দুর্ঘটনা প্রাণহানি, পণ্য ক্ষতিপুরণ চুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ইন্সুরেন্স পলিসি' থাকা বাধ্যতামূলক।

আনন্দপুরেরই নাজিরাবাদ অগ্নিকান্ডের মত মর্ম্মান্তিক ঘটনায় এই সত্যগুলো উঠে এসেছে যে বৈধ গোডাউন নির্ম্মাণের জন্য কোনও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছিল না। কারণ নাজিরাবাদ বা পূর্ব কলকাতার জলার উপর এই অবৈধ নির্ম্মাণ প্রকাশ্য দিবালোকে এবং পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় হয়। এবং এই গাফিলতি এবং উদাসীনতার চরম মূল্য দিতে হল অসংখ্য অসহায় দরিদ্র শ্রমিককে।

৩) অবৈধ নির্মাণ ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্ম্মচারীদের শ্রম সুরক্ষার কোনও বালাই নেই।

নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্য্যন্ত সরকার স্বীকৃত মৃতের সংখ্যা ২৭, যদিও তাদের কারোরই দেহ উদ্ধার করা হয়নি।১৮ জন শ্রমিকের দেহাবশেষ আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখনও ৯ জন শ্রমিকের DNA Test হয়নি।

ওয়াও-মোমো গোডাউনে কর্ম্মরত ২ জন শ্রমিক বারুইপুরের পঙ্কজ হালদার এবং দেবাশীষ হালদার। আগুনে ঝলসে তাদের মৃত্যু হয়। ওয়াও-মোমো এর গোডাউনের প্রবেশদ্বারে (যা তালা লাগানো ছিল) একজন নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন ছিলেন। তার নাম রবিশ হাসদা। তিনি সিকিউরিটি কোম্পানি NIS-এর স্থায়ী কর্মী ছিলেন। ওয়াও-মোমো তাদের গোডাউনে কর্মরত এই তিনজন শ্রমিককে মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে এবং তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পরিবার প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অনুসন্ধান পর্বে আমাদের কাছে এই তথ্য এসেছে যে ওয়াও-মোমো সংস্থার এবং NIS এর তিনজন কর্ম্মী কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি 'কর্ম্মচারী রাজ্য বীমা আইন ১৯৪৮ এর আওতাভুক্ত ছিলেন। ফলে এই তিনজনের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা তাদের প্রিয়জনদের কর্ম্মরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে ই এস আই অ্যাক্টের অন্তর্গত নির্ভরশীল সুবিধা (Dependent Benefit) পাবেন। পরিবারগুলি নির্ভরশীল সদস্যরা তাতেও আংশিক হলেও উপকৃত হবেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীনস্থ শ্রম নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে বিধি এবং নিরাপত্তা রয়েছে এই সমস্ত অবৈধ নির্ম্মাণ ক্ষেত্রগুলোতে, তার কোনওশ্রম আধিকারিকের নজরদারি বা শংসাপত্র থাকলে সোনারপুর এবং বারুইপুরের এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে এসেছে ডেকরেটর্সের কর্ম্মরত হতভাগ্য মৃত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিধির আওতাধীন না-হওয়ার বিষয়টি। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের পরিচালনাধীন দপ্তর কর্ম্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের ভূমিকাও এখানে বড় প্রশ্নের মুখে। বেশ কয়েক বছর হল কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ইন্সপেকশন পলিসি অনুসারে ই এস আই সি দপ্তর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কলকারখানা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা সমীক্ষার মাধ্যমে (১০ জন শ্রমিক কর্ম্মচারী থাকলেই সেই প্রতিষ্ঠান ই এস আই আইনের আওতাভুক্ত হবেন। যে প্রতিষ্ঠানে ১০ জন বা তার বেশী শ্রমিক কাজ করেন তারা এবং তাদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের (অন্যতম নয়া শ্রম কোড সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ২০১৯ যা ২১ শে নভেম্বর ২০২৫ থেকে ভারতে কার্যকর) আওতার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। ফলে অগ্নিকাণ্ডে নিহত নিউ পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটস ও নার্সারি প্রাইভেট লিমিটেডের আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া শ্রমিকদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা (স্ত্রী , বাবা-মা, সন্তান ইত্যাদি) নির্ভরশীল সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সারাজীবন পাওয়া এই আর্থিক সুবিধা থেকে পরিবারগুলো কিছুটা হলেও সাময়িক বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই মালিক, তোষণ নীতির শিকার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ অসংখ্য সামাজিক নিরাপত্তাহীন শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ। যদি রাজ্য জুড়ে সর্ব্বোপরি দেশজুড়ে সমীক্ষার মাধ্যমে ছোট-বড় অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, দোকান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে এই সামাজিক প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা যেত তবে স্বল্প মজুরি প্রাপ্ত এক বিশাল শ্রমিক শ্রেণি ই এস আই সি'র স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং আর্থিক সুবিধা পেত। যে কোনও মঙ্গলকারি রাষ্ট্রের এটা আশু কর্তব্য বলে সমিতি মনে করে।

৪) নরেন্দ্রপুর থানা ও বারুইপুর জেলা পুলিশের ভূমিকা

গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত আবেদন করে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৭ জন নিখোঁজ তালিকা দাবি করে। (এপিডিআর, গড়িয়া শাখার লেটার হেড, তারিখ ২৩/০২/২৬) কিন্তু নরেন্দ্রপুর থানায় এ এস আই শ্রী বিশ্বজিৎ পাল (যিনি এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার) এপিডিআরের প্রতিনিধি দলকে ২ ঘণ্টা বসিয়ে রাখেন এবং নিখোঁজ

ব্যাক্তিদের তালিকা দিতে অস্বীকার করেন। আমাদের সঙ্গে নরেন্দ্রপুর থানার আই সি দেখা করতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্য্যন্ত পুলিশের তরফে কোনও উত্তর এসে পৌছায়নি।

বারুইপুর জেলা মৃত ব্যাক্তিদের তালিকা প্রকাশ করছে না। এখানেই সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, হয়ত মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। শুধু তাই নয় নিউ পুস্পাঞ্জলি ডেকরেটার্সের মালিককে গ্রেপ্তার করলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী 'ওয়াও মোমো'র কর্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তার করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

যে শ্রমিকদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেনঃ

১। দেবাশীষ হালদার– ওয়াও মোমো

২। পঙ্কজ হালদার– ওয়াও মোমো

৩। রবিশ হাসদা– ওয়াও মোমোর নিরাপত্তা কর্মী (NIS কোম্পানির কর্মচারী)

৪। বক্তার– নিউ পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটার্স ও নার্সারি প্রাইভেট লিমিটেড

৫। জয়দেব মাজি– নিউ পুস্পাঞ্জলি ডেক ও নার্সারি প্রা লিমিটেড

৬। বিমল মাইতি– নিউ পুস্পাঞ্জলি ডেক ও নার্সারি প্রা লিমিটেড

৭। শ্রীকৃষ্ণ মাইতি– নিউ পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটস

প্রশাসনিক গাফিলতি, উভয় সংস্থার কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা এবং দেশের সমস্ত আইন লঙ্ঘন করে ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে দরিদ্র শ্রমিকদের ন্যুনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়া ও বেআইনি নির্ম্মাণ করে শ্রমিকদের জতুগৃহে মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করার ফলেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও ২৭ জন শ্রমিকের জীবন্ত দগ্ধ হওয়ায় পরিপ্রেক্ষিতে এ পি ডি আরের দাবি—

১. মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে শুধু আর্থিক ক্ষতিপুরণ নয়, তাদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যকে সরকারী স্থায়ী চাকরি দিতে হবে।

২. দি ইষ্ট ক্যালকাটা ওয়েট ল্যান্ডস ম্যনেজমেণ্টকে কলকাতার বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে পূর্ব কলকাতার জলাভুমি রক্ষার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সমস্ত বেআইনি নির্ম্মাণকে ভেঙ্গে দিতে হবে।

৩. অগ্নি সুরক্ষা বিধির প্রয়োজনীয় শংসাপত্র না থাকলে কোনও গোডাউন নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া চলবে না।

৪. রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর যেন পূর্ব কলকাতার জলাভুমি তথা কোনও জমির চরিত্র বদল করে বেআইনি রূপান্তর অনুমোদন বন্ধ করতে হবে।

৫. অবিলম্বে মৃত শ্রমিকদের ঠিকানা সহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৬. ওয়াও মোমোর মালিকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

৭। কেন্দ্রীয় সরকারের ই এস আই কর্পোরেশনকে ১০ জন বা তার বেশী সংখ্যক শ্রমিক যেখানে কাজ করেন সেই সমস্ত সংস্থাকে সমীক্ষার মাধ্যমে অবিলম্বে ই এস আই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরকে অবিলম্বে সমস্ত কারখানার মালিকদের কর্ম্মরত শ্রমিকদের আইনানুগ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশ কার্য্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

রিপোর্ট: জেল উপ-সমিতি

২০ জানুয়ারী, ২০২৬, রাজনৈতিক বন্দি নারায়ণ মাহাতোর জামিন প্রসঙ্গে আইজি কারার কাছে ডেপুটেশন।

২৩ বছরের অধিক সময় ধরে কারাবাসে থাকা রাজনৈতিক বন্দি নারায়ণ মাহাতো এবং ১৫ বছর অতিক্রান্ত জেলে বন্দি রাজনৈতিক ও সাধারণ বন্দিদের জামিনের বিষয়ে কথা বলার জন্য এপিডিআর এর এক প্রতিনিধি দল আইজি কারার কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়। আইজি কারা না থাকায় আমরা ডিজি নন্দন কুমার বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে ডেপুটেশন দিই ও এই বিষয় সম্পর্কে বিশদে কথা বলি।

নারায়ণ মাহাতো দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে কারাবাসে রয়েছেন। প্রথমে পুরুলিয়া জেলে এবং পরে কলকাতার নানা জেলে থেকে বর্তমানে দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও জামিন পাননি। যেখানে অনেক বন্দি সাধারণত এই সময়কালের মধ্যে জামিন পান। রাষ্ট্রের কোনও অজ্ঞাত কারণে তিনি জামিন পাননি। বলা ভালো তাকে জামিন দেওয়া হবে না, এটাই হয়ত রাষ্ট্র চায়।

নারায়ণ মাহাতোর কেস এপিডিআর বহু বছর ধরে লড়ছে। তেইশ বছরের অধিক সময় ধরে তিনি জেলে বন্দি আছেন। প্যারোলে তিনি কয়েকবার বাড়িতেও গিয়েছেন। কিন্তু কখনোই জামিন পাননি। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী জামিনের নিয়ম, জেল ব্যতিক্রম, এই কথাটা নারায়ণ মাহাতোর কেসে ব্যতিক্রম বলেই আমাদের মনে হয়। ষ্টেট সেন্টেন্স রেমিসন বোর্ড কোনোমতেই ওনাকে মুক্তি দিতে রাজি নয়। হাইকোর্টের বিচারপতি তাঁর মামলায় রায় দিতে গিয়ে বলেন, এন এইচ আর সি' র গাইডলাইন মেনে রেমিশন বোর্ড তৈরী

হয়নি। বিচারপতি তার রায়ে রেকমেন্ডেট এবং রিকনষ্ট্রাক্টিভ এই কথাটি উল্লেখ করেন। যা জামিনকে ইঙ্গিত করে বলে আমরা মনে করি।

এই প্রসঙ্গে ডিজি জানান, তিনি আন্তরিকভাবে চান নারায়ণ মাহাতো জামিন পান। কিন্তু তার জামিন বা মুক্তির সমস্ত বিষয়টা রাজ্যের উপর নির্ভর করছে, এক্ষেত্রে তাদের কিছু করার নেই। আমাদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা হয় এবং জেলে ও প্যারোলে থাকাকালীন স্থানীয় পুলিশের দেওয়া ভাল রিপোর্টের কথা বলে তাঁর জামিনের জন্য আবেদন জানানো হয় ডিজির কাছে। ডিজির একটাই বক্তব্য, এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। মুক্তির বিষয়টা সরকারের ইচ্ছাধীন। রেকমেন্ডেড এবং রিকনষ্ট্রাকটিভ করার কথা বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। যার একটাই অর্থ দাঁড়ায়, জামিন। অবশেষে তিনি জানান, তারা তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলবেন।

রাজনৈতিক বন্দি কল্পনা মাইতি, রাজেশ মুন্ডা ও কানাই হাঁসদা ১৫ বছরের ওপর জেলে বন্দি রয়েছেন। তাঁদের জামিনের প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলে ডিজি কথা বলতে অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, এদের নাম ডেপুটেশনে উল্লেখ নেই। অথচ ডেপুটেশনে আদারস পলিটিকাল প্রিজনার্স কথাটির উল্লেখ ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি অথবা জামিন বিষয়ে কথা শোনায়, জেল কর্তৃপক্ষের অনীহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

জেলখানায় ধারণ ক্ষমতা অতিরিক্ত বন্দিদের রাখা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিও যুক্ত। ভাল মানের খাদ্য দেওয়া, এই বিষয়গুলি উত্থাপন করলে কারা আধিকারিক জানান, ধারণ ক্ষমতা অতিরিক্ত বন্দিদের ঠিকভাবে রাখার জন্য তারা চেষ্টা করবেন। অনেক জেলেই নিয়মিত ডাক্তার থাকেন না; এ-কথা তিনি স্বীকার করলেন। কারণ হিসেবে তার ব্যাখ্যা, জেলে ডাক্তাররা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে চান না। তবে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে ডাক্তার পাওয়া যায়। তিনি দাবি করেন বন্দিদের যথেষ্ট ভাল মানের খাদ্য দেওয়া হয়।

হাওড়া জেলে এপিডিআর-এর প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে ডিজির অকপট স্বীকারোক্তি, জেল আধিকারিকরা রাজনৈতিক বন্দি মানেই মাওবাদী এটা ধরে নেন। মাও বাদীদের সম্পর্কে জেল আধিকারিকরা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। নেতিবাচক মানসিকতার কারণেই তারা রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে চান না। তবে এপিডিআর আইজি কারার কাছে চিঠি বা মেইল করে অনুমতি নিয়ে দেখা করতে পারবেন। এরপর আমরা কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ'র সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু তখন তিনি অফিসে ছিলেন না, ফলে তার অফিসের একজন আধিকারিক এর কাছে আমরা ডেপুটেশন দিই এবং মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময় চাই। আধিকারিক জানান মন্ত্রীর পি এ-এর সঙ্গে কথা বলে তিনি আমাদের জানাবেন।

জেল পরিদর্শনের প্রতিনিধি দল: জয়শ্রী পাল, সোমনাথ মুখার্জী, কোয়েলী গাঙ্গুলী, অমিতাভ সেনগুপ্ত, চৈতালী দাশ।

রিপোর্ট: কৃষ্ণনগর পৌরসভায় ২৭০ জন চুক্তি ভিত্তিক কর্ম্মী ছাঁটাই

কৃষ্ণনগর পৌরসভায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে ২০২৫-এ ভেঙে যায় পুরবোর্ড। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এসডিও-কে প্রশাসক হিসেবে বসানো হয়। তিনি ক্ষমতা হাতে নিয়েই দু'ক্ষেপে প্রায় ২৭০ জন ক্যাজুয়াল কর্ম্মীকে অন্যায় ভাবে ছাঁটাই করেন। যুক্তি দেখান এরা অবৈধ ভাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনের তুলনায় 'বাড়তি'! কৃষ্ণনগরের সাংসদ সরাসরি এই সিদ্বান্তকে সমর্থন করে বলেন, এই অতিরিক্ত কর্ম্মচারীদের বেতনভার বহন করতে গিয়েই নাকি কৃষ্ণনগর পৌরসভা 'দেউলিয়া' হয়ে গেছে! ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্যায় ভাবে ছাঁটাই হওয়া কর্ম্মীরা। এদের বড় অংশ কুড়ি বছরের বেশী সময় ধরে পৌরসভায় কাজ করেছেন। কৃষ্ণনগরবাসীকে দিয়েছেন পৌর পরিষেবা।

উক্ত কর্ম্মীদের চাকরি জীবনে বিভিন্ন সময়ে ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, কাটা হয়েছে ই পি এফ, গ্রাচুইটি। অথচ সমস্ত সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোনও আগাম নোটিস না-দিয়ে রাতারাতি ছাঁটাই করা হলো এই কর্ম্মীদের। উল্লেখযোগ্যঃ শাসক দল-তো নয়ই, অন্য কোনও রাজনৈতিক দল বা বাম ট্রেড ইউনিয়নও এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি। একমাত্র এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখা সঙ্গে থাকে কর্ম্মীদের। পৌরসভার গেটে অপসারিত কর্ম্মীদের লাগাতার ধর্ণা অবস্থানে সমর্থনে বসে থাকেন এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখার কর্ম্মীরা। ছাঁটাই হওয়া কর্ম্মীদের উপর পুলিশি নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করে।

নতুন শ্রম আইনে যখন দেশের বিজেপি সরকার চুক্তি-ঠিকা শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকারগুলোও কেড়ে নিতে চাইছে এবং রাজ্যের শাসক দল বকলমে তার লেজুড়বৃত্তি করছে; তখন জীবন ও জীবীকার অধিকারের দাবিও যে

মানবাধিকার আন্দোলনের গুরুত্বপুর্ণ দিক, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই এপিডিআর নৈতিক ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে ছাঁটাই পুর কর্ম্মীদের পুনর্নিয়োগের দাবি-আন্দোলনের পাশে। যে-লড়াই গত আড়াই মাস ধরে এখনও চলমান। (জানুয়ারী ২০২৫-এ শুরু হয়ে এখনও চলছে।)

বিশেষ সংবাদ

অ্যাসিড আক্রমণে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ

বাপী দাশগুপ্ত

এন সি আর বি'র রিপোর্ট অনুসারে ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ এরপর ২০২৩-এও পশ্চিমবঙ্গে দেশের মধ্যে সব থেকে বেশী অ্যাসিড আক্রমণ হয়েছে। এন সি আর বি'র রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ জনের উপরে অ্যাসিড আক্রমণ (আই পি সি ৩২৬ এ) হয়েছে এবং ৬ জনের উপরে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে (আই পি সি ৩২৬ বি) বলে নথিভূক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ২৮ জন আক্রান্ত এবং ৪ জনের উপরে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে। অ্যাসিড আক্রমণের হিসেবে, ২০২০ সাল থেকে চার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থানে থাকা পশ্চিমবঙ্গের একটা 'বড় কৃতিত্ব'!

পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলির বন্দি-ধারণ ক্ষমতা। এন সি আর বি'র রিপোর্ট অনুযায়ী ৩১-১২-২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে জেলগুলির পরিসংখ্যান—

জেল	ধারণ ক্ষমতা	বন্দি	শতকরা হার
কেন্দ্রীয়	১৩৮৪৮	১৩৫৯৮	৯৮.২
জেলা	৩৮১৮	৬০৫১	১৫৮.৫
সাব	২৪২৮	৪২৯৩	১৭৬.৮
মহিলা	৩১৪	৩৪৬	১১০.২
মুক্ত	৪৮৩	৩২৯	৬৮.১
বিশেষ	৫৮৫	১১৫৭	১৯৭.৮
মোট	**২১৪৭৬**	**২৫৭৭৪**	**১২০**

রিপোর্ট

কৌতুকপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধেও দেশদ্রোহের মামলা

অমিত নন্দী চুঁচুড়ার একজন সুপরিচিত বিজ্ঞান কর্ম্মী ও সমাজকর্ম্মী। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, গভীর রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এপিডিআর-এর প্রাক্তন সভাপতি ও চুঁচুড়ার বাসিন্দা অমিতদ্যুতি কুমার অ্যারেষ্ট মেমোর কপি দিয়ে সেই বিষয়টি একটি অধিকার সংক্রান্ত গ্রুপে পোষ্ট করেন। সেই পোষ্ট দেখে চুঁচুড়া শাখা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এফ আই আর এর কপি জোগাড় করা হয়। জানা গেছে, পুলিশের 'Safe drive Save Life' প্রচার নিয়ে ফেসবুকে 'কোনও আপত্তিকর পোষ্ট' ফরওয়ার্ড করার কারণে পুলিশ স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে।

সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যে ধারা দেওয়া হয়, তার বাইরে আরও দু'টো জামিন অযোগ্য (ননবেলেবেল অফেন্সে) ধারা দেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ IPC 124A (Sedition)-এর নতুন রূপ BNS 152 দেওয়া হয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন। এর সঙ্গে BNS 197(1)(d) ধারা দেওয়া হয়েছে, যাতে বলা আছে, ''makes or publishes false or misleading information, jeopardising the sovereignty, unity and integrity or security of India, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both''

১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, অমিতকে কোর্টে পেশ করা হয় এবং দু'দিনের পুলিশ রিমান্ড হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারী জামিন হয়নি, এবং ৭ দিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়। পরবর্তী শুনানি ধার্য্য হয় ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী আক্রান্তের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এ পি ডি আর-এর সদস্যরা তমলুক কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। চুঁচুড়া শাখা পুলিশের এই অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে চুঁচুড়ায় বেশ কিছু জায়গায় পোষ্টার লাগিয়েছে। ইতিমধ্যে, ফেসবুকে একটি ব্যঙ্গমূলক পোষ্ট ফরওয়ার্ড করার জন্য দেশদ্রোহিতার ধারা দিয়ে এইভাবে গ্রেফতার করার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়। ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়।

এ পি ডি আর-এর চারজনের এক প্রতিনিধি দল ভবানী ভবনে ডিআইজি হেড কোয়াটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁকে এ পি ডি আর-এর পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে ফেসবুকে কোনও রসিকতামূলক পোষ্ট ফরওয়ার্ড করা কোনও অপরাধ নয় এবং পূর্ব মেদিনিপুরের পুলিশ সমস্ত আইন কানুনের বাইরে গিয়ে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে অমিত নন্দীর বিরুদ্ধে BNS ১৫২ ও ১৯৭ ধারা প্রয়োগ করেছে। এবং তাঁকে একটি মেমোরান্ডাম জমা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করবেন।

পরের দিন একুশে ফেব্রুয়ারী বিকেল থেকে পূর্ব-মেদিনিপুরের পুলিশের পক্ষে অ্যাডিশনাল এসপি ও কেসের আই ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা বলেন, পুলিশ ভুল করে ফেলেছে এবং ২৩ তারিখে অবশ্যই অমিতের জামিন হয়ে যাবে। ২২শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা বেলা কেসের আইও চুঁচুড়া শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন যে, জামিন অবশ্যই হবে এবং এ পি ডি আর তমলুক কোর্টে ২৩ তারিখ যেন কোন প্রতিবাদ কর্ম্মসূচী না-নেয়। তাঁকে জানানো হয়, কোনও কর্ম্মসূচী নেওয়া হলে তা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নেওয়া হবে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী তমলুক কোর্টে চুঁচুড়া শাখার সদস্যরা এবং কলকাতা থেকে কয়েকজন সদস্য হাজির হন এবং কোর্টের বাইরে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জামিনের শুনানি চলাকালীন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একটি পোষ্ট ফরওয়ার্ড করার জন্য এক ৬২ বছর বয়সী মানুষের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার ধারা লাগানোর জন্য কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জামিন মঞ্জুর করেন।

অমিত নন্দী বাড়ি ফেরার পর এপিডি আর-এর পক্ষ থেকে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, কেসটি খারিজ করানোর জন্য অবশ্যই হাইকোর্টে মামলা করা প্রয়োজন এবং সংগঠন এই ব্যাপারে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করেছে। তিনি এপিডিআর-কে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন।

অমিত নন্দী'র বাড়ির কাছে তোলাফটক মোড়ে ১০ই মার্চ, ২০২৬, বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে একটি পথসভা করে চুঁচুড়া শাখা। বর্তমানে শাখার উদ্যোগে হাইকোর্টে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া চলছে।

রিপোর্ট: কেন্দ্রীয় কর্ম্মসূচী

২ আগষ্ট, ২০২৫, কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে অধিকার আইনে ও বাস্তব বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। বক্তা ছিলেন, মানবাধিকার আইনজীবী সেঁজুতি চক্রবর্তী। ২০ আগষ্ট, ২০২৫, হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়। বিষয় জম্বু কাশ্মীরে অরুন্ধতী রায় সহ বিভিন্ন সত্যানুসন্ধানী ইতিহাসবিদ লেখক সাংবাদিকের ২৫ টি বই নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে, দেশজুড়ে 'অপারেশন কাগার' বন্ধ করে মাওবাদীদের সঙ্গে 'শান্তি আলোচনা' শুরু করার দাবিতে। মহারাষ্ট্রে আরবান নকশাল দমনের নামে সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার নয়া আইন এম এস পি এস-এর বিরুদ্ধে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী-গবেষকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবিতে এই সভা হয়।

৬ সেপ্টেম্বর,২০২৫, আলোচনা সভা– বিষয় এস আই আর, ভোটার তালিকা নিবিড় পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ উজ্জয়িনী হালিম। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এস আই আর নিয়ে সভা ও ডেপুটেশন যৌথ উদ্যোগে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ চিকিৎসার অভাবে হাওড়ায় মেট্রোরেল যাত্রীর অপমৃত্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের চরম অমানবিক আচরণ ও নিয়মিত চরম যাত্রী হয়রানির প্রতিবাদে মেট্রোরেল ভবনে জি এম ডেপুটেশন।

২৪ অক্টোবর, ২০২৫, এস আই আর নিয়ে যৌথ প্রেস কনফারেন্স। ২৫-১০-২০২৫ এস আই আর নিয়ে যৌথ মিছিল। ২৯ অক্টোবর, ২০২৫, এস আই আর নিয়ে ত্রিপুরা হিতসাধনী হ'লে আলোচনা সভা। ৩১ শে অক্টোবর কলেজস্ট্রিট বিদ্যাসাগর মুক্তির সামনে 'মত প্রকাশের অধিকারে পুলিশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে', ফেসবুকে এস আই আর বিরোধী পোষ্টের জন্য বিভিন্ন সমাজকর্ম্মীদের পোষ্ট ভারতে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ধিক্কার সভা। অন্যায় ভাবে পুশব্যাক করা সোনালী বিবি ও তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার দাবিতে এসআই আর বাতিলের দাবিতে নাগরিক প্রতিবাদ সভা হয় হাজরা মোড়ে ৬ নভেম্বর। ১৫ নভেম্বর ২০২৫ ছাড়া রাজ্যজুড়ে এস আই আর ও এনআরসি আতঙ্কিত মানুষের হেনস্থা ও মৃত্যু-মিছিল বন্ধ করার দাবিতে অবিলম্বে এস আই আর বাতিলের দাবিতে ফেসবুকে এসআইআর বিরোধী লেখাপত্রের জন্য রাজ্য পুলিশের নির্দেশে এপিডিআর ও এন আর সি মুভমেন্ট সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্ম্মীদের ফেসবুক একাউন্ট বন্ধ করে মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে নাগরিক প্রতিবাদ মিছিল হয় কলেজ স্ট্রিট বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত। ২০ নভেম্বর নাগরিক প্রতিবাদ সভা হিদমা সহ সকল মাওবাদী রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মী হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে এনকাউন্টারের নামে ভুয়া সংঘর্ষে মাওবাদী রাজনৈতিক নেতাকর্ম্মীদের হত্যা বন্ধের দাবিতে ও অবিলম্বে অপারেশন সহ সমস্ত রাজনৈতিক হত্যা অভিযান বন্ধের

দাবিতে নাগরিক প্রতিবাদ সভা হয় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে।

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে অপারেশন কাগার নামে গণহত্যা বন্ধ করা এবং লাদাখ, বস্তার সহ দেশজুড়ে রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নাগরিক প্রতিবাদ মিছিল কলেজস্ট্রিট বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে পৌঁছায় ধর্মতলা। সেখানে বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। ১৪/১২/২০২৫ সংগঠন ত্যাগী সদস্যদের বিভিন্ন অংশ কে ফিরিয়ে আনতে ঐক্য প্রয়াসে যৌথ বিশেষ সাধারণ সভা হয় ভারতসভা হলে।

৩ ও ৪ জানুয়ারী, ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের ৩০ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। হুগলি জেলা এপিডিআর এই সম্মেলনের দায়িত্ব নিয়েছিল। জেলার কোন্নগরের মহাদেশ পরিষদের সভাগৃহে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের এই কেন্দ্রীয় সম্মলনে সমগ্র রাজ্য থেকে সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ৪৭টি শাখা এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকেছে। সম্মেলনের সভা থেকে সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন সঞ্জীব আচার্য্য, কার্য্যকরী সভাপতি সোমনাথ বসু, কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ মুখার্জী এবং সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন আলতাফ আহমেদ।

১১ জানুয়ারি ২০২৬ ভারত সভা হ'লে SIR নিয়ে যৌথ আলোচনা সভায় সদস্যরা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। ১৩-১-২০২৬ আমেরিকার আগ্রাসী ও বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে যৌথ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সদস্যরা। ১১-২-২৬ বিজ্ঞান কর্ম্মী আমি চাঁদকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। ১৩/২/২০২৬ SIR নিয়ে প্রেসক্লাবে যৌথ কনফারেন্স এ বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মৌলালী রামলীলা ময়দান থেকে যৌথ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সদস্যরা। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ার এ আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলায় সংগঠনের প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে সদস্যরা। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সমাজকর্মী অমিত কুমার নন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে তমলুক কোর্টে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংগঠনের সদস্যরা। ২৬-০২-২০২৬ NIA এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের ও ব্যাঙ্কসাল কোর্টে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয় সংগঠনের তরফে। ২৮/২/২০২৬ এ SIR-NRC যৌথ সভায় সদস্যরা বক্তব্য রাখেন কলেজ স্ট্রিটে।

১০ মার্চ ২০২৬ লক্ষ লক্ষ বাঙালির ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং এসআইআর এনআরসি সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে দুই দিনের গণ-অবস্থান হয় কলেজ স্ট্রিটে। বিভিন্ন গণসংগঠন ও ব্যক্তিদের ডাকে এই অবস্থানে সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ১৬ মার্চ, ২০২৬, লক্ষ-লক্ষ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ৬০ লক্ষ ভোটারকে সন্দেহজনক নাগরিক বানিয়ে বিচারাধীন রেখে বিধানসভা ভোট ঘোষণার বিরুদ্ধে এবং এস আই আর বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ সভা হয় কলেজ স্ট্রিট মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের সামনে। ২৪ মার্চ ২০২৬ ঐক্যের উদ্দেশ্যে আলোচনার আয়োজন করা হয়।

---

২ পাতার পর

না ফেরার দেশে চলে গেল বাবলা ওরফে বসন্ত ভট্টাচার্য্য

হাঁটা বাবলা বহু মিটিং মিছিলে অংশ নিতে দেখেছি। দিনবদলের স্বপ্ন বুকে নিয়ে বলা যায় গত শতাব্দী'র ৮০র দশক থেকেই কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিত।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে ওর সংসার চলতো। শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি, তাঁদের দর্শনের প্রতি ছিল ওর প্রগাঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং ওর মতো করেই এক স্বচ্ছ ধারণা লালন পালন করতো।

সংগঠনের কর্ম্মসূচীর প্রতি ওর আনুগত্য এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল নজর কাড়া। সংগঠন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করলে কোনও বাধাই ওকে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারতো না। আরো একটা উল্লেখ্য সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে মেলামেশা ছিল অবাধ। এমনকি ভিন্নমতের মানুষকে ও এপিডিআর-এর কাছাকাছি আনার চেষ্টা করত। ভিন্ন মতের হলে আলোচনা করলেও একা হয়ে যেতে পারে এই ভীতি ওর মধ্যে ছিল না। যখন কোনো সভায় কেউ যেতে পারছি না বাবলাকে অনুরোধ করলে বাবলার মুখে না নেই, ও ঠিক চলে যেত।

বাবলা ভট্টাচার্য্যর জীবনাবসান হলেও সংগঠনের প্রতি মমত্ববোধ, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ওর শ্রদ্ধাবোধ আমাদের কাছে শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে।